সুপ্তবাসনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ

অক্ষয় তৃতীয়া : ১৩৫৯

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন

কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক করেছেন :

সিবিএইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)

কলকাতা-৭০০০০১

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

নিউ প্রাইমা প্রেস

কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :

সুনীল কুমার ভাণ্ডারী

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স

৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

সিদ্ধার্থ ঘোষ
প্রিয়বরেষু

একতলার ঘরের রাস্তার পাশেই জানালা। জানালা খোলা রাখলেও ঘরের মধ্যে বেশী আলো আসে না। আর জানালা বন্ধ করে রাত্তিরে ঘুমোবার কোন উপায় নেই, দম বন্ধ হয়ে আসে। এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়েরও ভয় আছে। তাই বাড়িওয়ালাকে বলে বলে তিন মাস পরেও কিছু হল না দেখে ভাড়ার টাকা থেকে খরচ কেটে নিয়ে রাস্তার ধারের জানালা দুটোতে তারের জাল লাগানো হয়েছিল।

একটা জানালার পাশে রণুর পড়ার টেবিল। রাস্তা দিয়ে যারা যায়, তারা রণুর দিকে এক পলক তাকিয়েই ভাবে, লোহার গরাদ ও জাল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার কুঠরিতে ঠিক যেন এক বন্দী কিশোর বসে আছে। এক এক সময় রণু যখন জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, তখন নিজেকেও তার বন্দী মনে হয়। অথচ ঘরটাও রণুর খুব প্রিয়। তার নিজের ঘর।

আকাশ একটু মেঘলা থাকলে ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায় দিনের বেলাতেই। তখন আর নিজের হাত পা-ই দেখা যায় না ভাল করে। একদিন এমনি মেঘলা সকালবেলা রণু মোম জ্বেলে পড়াশুনো করছিল। তাই দেখে পাড়ার সান্টুদা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর মুচকি হেসে আবৃত্তি

করল, যে-জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি। আশু গৃহে তার জ্বলিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি···বুঝলি রণু? দিনের বেলা মোম জ্বেলেছিস কেন?

রণু বলেছিল, কী করব, কিছু দেখা যায় না যে।

সানুদা বলেছিল, আলো জ্বাল্। আলো নেই?

রণু উত্তর দিয়েছিল, লোড শেডিং যে।

সাণুদা হো হো করে হেসে বলেছিল, তাই তো! ঐ পদ্যটা যে লিখেছে, সে লোড শেডিং-এর কথা জানত না।

রাস্তা মানে সরু গলি। ঠিক উল্টো দিকেই একটা পাঁচিল ঘেরা বড় বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোন থেকে একটা পেয়ারা গাছ মাথা উঁচিয়ে পাঁচিল ছাড়িয়ে রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে। রণু মাঝে মাঝে সেই পেয়ারা গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে। পাতার ফাঁক দিয়ে একটু একটু আকাশ।

জানালায় জাল লাগানো হয়েছিল, কিন্তু রং করা হয় নি। তাই আট ন'মাসের মধ্যেই মর্চে ধরে জালে ফাটল ধরল। রণু নিজেই কট্ করে একটা শব্দ শুনল একদিন। তাকিয়ে দেখল যে তিন চার জায়গায় জাল কেটে গেল একসঙ্গে। আপনি আপনি।

রণুর মাঝে মাঝে ভয় হয়। হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে মাথা ব্যথা শুরু হয়। চোখ দুটো ছলছল করে, কিছুই আর ভাল লাগে না। তক্তপোষের ওপর বিছানাটা গোটানো থাকে, সেটা না খুলেই রণু শুয়ে পড়ে। একটু বাদেই মা টের পেয়ে যান। তার মানেই ভাত বন্ধ। দু'পিস স্যাঁকা পাঁউরুটি। রণুর বিচ্ছিরি লাগে পাঁউরুটি খেতে। দু'দিনের মধ্যেও জ্বর না কমলে বাবা রণুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন গ্রে স্ট্রীটে উপেন ডাক্তারের কাছে। উনি বাবার কাছ থেকে মাত্র দু'টাকা ফি নেন। আর কমলা রঙের মিক্সচার তিন টাকা বারো আনা। প্রত্যেক বারেই উপেন ডাক্তার বাবাকে বলেন, সরোজবাবু, একবার ছেলেটার রক্তটা পরীক্ষা করান। আপনাকে তো বলেছি···

বাবা তার উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, দেখছি, এই সামনের মাসেই···। বাবা তখন রণুর দিকে বিরক্ত ভাবে তাকান।

রণুর খুব লজ্জা করে তখন। যেন জ্বর হওয়াটা তারই অপরাধ। শুধু জ্বরের জন্য বাবার পয়সা খরচ। রণু জানে তাদের সংসারে সব সময় একটা টানাটানির ভাব থাকে। তার ওপর জ্বরের জন্য এই রকম বাজে খরচ করার কোন মানে হয় না। আর কোন ছেলের জ্বর হয় না, শুধু রণুরই জ্বর হয় কেন?

জ্বরটা সেরে যাবার মুখে সব সময় একটা খাই খাই ভাব। বিশ্ব সংসারের সব কিছু খেয়ে ফেলেও যেন খিদে মিটবে না। অথচ আটানব্বই পয়েন্ট দুই জ্বর থাকলেও মা ভাত দেবেন না। বিকেলে রণুর জ্বর সাতানব্বই, তবু রাত্রে নয়, ভাত পাওয়া যাবে কাল দুপুরে। সন্ধ্যের সময় বসে বসে রণু সেই ভাতের কথাই ভাবে। কাঁচকলা সেদ্ধ, ডাল, সিঙ্গি মাছের ঝোল আর ভাত। কাল এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই রণু খেয়ে নেবে। তারপর জেগে থাকতে হবে সারা দুপুর। জ্বর সারার দিন প্রথম ভাত খেয়ে দুপুরে ঘুমোলেই আবার জ্বর।

তখন বাজে পৌনে ছ'টা, পৌনে ন'টার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে হল তিন ঘণ্টা। কাল যদি সাতটায় ঘুম থেকে ওঠে তাহলে এগারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা সাত ঘণ্টা বাদেই রণু ভাত খাবে।

ঠিক সেই সময় কাঁধে টিনের বাক্স নিয়ে একটা লোক জানালার ধারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রণুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর অবাধ্য ঘোড়ার মতন ঘাড়টা বাঁদিকে বাঁকিয়ে সে শুরু করল একটা গান। ঠিক ওস্তাদি গানের মতন। গানটা এই রকমঃ আলু দম্ ম্ ম্ ম্ ম, ন-আ-আ-র-কোলের-র-র-র ঘুগনি! প্যাঁ-টা-র-র-র-র ঘুগনি।

গানটি শেষ করে, মাকড়সা যেমন ভাবে জালে পড়া পোকাকে দেখে, সেই ভাবে সে রণুর দিকে তাকিয়ে রইল।

রণু খুব নম্র লাজুক গলায় জিজ্ঞেস করল, কত করে ?

লোকটি আবার ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, পনেরো নয়া, কুড়ি নয়া, পঁচিশ নয়া—

ঘুগনিওয়ালাটি এ পাড়ায় নতুন। চোখে নিকেলের চশমা। রণু এর আগে কখনো চশমা পরা ঘুগনিওয়ালা বা বাদামওয়ালা দেখে নি। একটুক্ষণ চিন্তা করে রণু বলল, দেখি কুড়ি নয়ার, ঐ নারকেলেরটা…।

—দরজা কোন্ দিকে ?

—এই জানালা দিয়েই দিন।

তারের জাল যেখানে কেটে গিয়েছিল, সেখানে আঙুল ঢুকিয়ে চাড় দিতেই আরও কয়েকটা ছিঁড়ে গেল। তারপর টিপে টুপে একটা টেনিস বলের সাইজের গোল গর্ত বানানো হল কোনক্রমে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুগনি কিনতে হলে সে ধরা পড়ে যাবে।

রণুর কাছে পয়সা নেই। কিন্তু সে দাদার কাছে আট আনা পয়সা পায়। পুরোণো খবরের কাগজ বিক্রির টাকা দাদাই নেয় সবটা। কিন্তু গতকাল কাগজ বিক্রির সময় রণু তার আগের ক্লাসের সব খাতাগুলো দিয়েছিল। দাদা বলেছিল এজন্য আট আনা পরে দেবে রণুকে।

রণু দাদার ঘরে গিয়ে দেখল দাদা নেই। একটু আগেই দাদার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। নিশ্চয় বাথরুমে গেছে। এই রে, ঘুগনিওয়ালাকে এখন পয়সা দেবে কি করে ? মা'র কাছে পয়সা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাবধানে সে দাদার টেবিলের ড্রয়ার খুলল। অনেক খুচরো সেখানে, রণু কুড়ি পয়সা তুলে নিয়ে এলো।

কাঠের চামচেতে প্রথম একটু ঘুগনি চেখেই রণুর মুখটা অন্য রকম হয়ে গেল। এ যে অমৃত ! এমন চমৎকার স্বাদের ঘুগনি সে জীবনে আর কখনও খায় নি তো ! জ্বরের জন্য তার মুখটা বিস্বাদ হয়ে ছিল। কিন্তু ঘুগনিতে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বদলে দিল। ঘুগনিওয়ালাটা যেন

শুধু তার জন্যই আজ এ পাড়ায় এসেছে। কিন্তু মাত্র এইটুকু! মোটে চার চামচ! ঘুগনিওয়ালাটি চলে যাওয়ার আগেই সে বলল, দেখি আরও কুড়ি পয়সার—

দ্বিতীয়বার দাদার ড্রয়ার থেকে পয়সা আনতে গিয়ে সে মায়ের চোখে পড়ে গেল। তক্ষুনি দাদাও বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। তারপর মায়ের চেঁচামেচি, দাদার বকুনি। ঘুগনিওয়ালাকে ধমকে ধামকে তাড়ানো হল। দাদা বললে, তোর এতখানি নোলা যে পয়সা চুরি করে…।

রণু বলল, আমি তো তোমার কাছে পয়সা পেতাম। চুরি করব কেন?

কিন্তু এ যুক্তি দাদা মানল না। মুখে মুখে তর্ক করার অভিযোগে একটু বাদেই রণু দাদার হাতে মার খেল, তার দাদার মাথা গরম, যখন তখন গায়ে হাত তোলে। দাদার তুলনায় রণুর চেহারাটা বড্ড ছোট-খাটো। অন্য সময় মা দাদাকে কিছু বলে না, কিন্তু অসুস্থ ছোট ভাইকে মারবে কেন? সেইজন্য তখন মা বকল দাদাকে। রণু নিঃশব্দে কেঁদে ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। এবং ঘুমের মধ্যেও অনেকক্ষণ কাঁদল।

এর দশ দিনের মধ্যেই জানালার ফুটোটা এত বড় হয়ে গেল যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে একটা বেড়াল গলে যায়। সেই ঘুগনি-ওয়ালাও নিয়মিত আসে।

যখন জ্বর থাকে না, রণু অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। আগে যখন দাদার সঙ্গে এক ঘরে থাকত, আলো নেভাতে হত দাদার ইচ্ছে মতন। দাদার কোন মেজাজের ঠিক নেই। কখনো রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকবে কখনো সাড়ে ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। দাদা ঘুমোলে আর আলো জ্বালা চলবে না।

আগে এটা ছিল চাকরের ঘর। চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর এসেছিল একজন অল্পবয়েসী রাঁধুনী, সে একদিন রাত্তিরবেলা

রাস্তায় টিউবওয়েলের কাছে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল বলে তাকে বিদায় করে দেওয়া হয় পরের দিনই। এখন যে বুড়ি রাঁধুনি আছে সে রান্নাঘরেই শোয়। তাই রণু এই ঘরটা পেয়েছে। এটা তার একটা মস্ত বড় লাভ। সম্পুর্ণ নিজস্ব একটা ঘর, ভাবা যায়! একটা তক্তাপোষ আর টেবিল পাতার পর আর একটুও জায়গা নেই। তবু রণু খুব খুশি। দাদাও খুশি হয়েছে নিজের আলাদা ঘর পেয়ে। মেজদি শোয় মা-বাবার ঘরে। মেজদি এই ঘরটার দাবিদার ছিল, কিন্তু মা রাজি হন নি মেয়েকে একলা ঘরে শুতে দিতে। মেজদি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে প্রায়ই।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ে রণু। যখন জ্বরে ভোগে, তখন রণু প্রায় সারাদিনই ঘুমোয়। আর যখন তার জ্বর থাকে না, তখন সে যতক্ষণ সম্ভব জেগে থাকতে চায়। জ্বরের সময় পড়তে ইচ্ছে করে না, চোখ জ্বালা করে, তাই পড়াশুনোও পুষিয়ে নিতে হয় অন্য সময়। রাস্তাঘাট যখন সুনসান হয়ে আসে, সব শব্দ থেমে যায় আস্তে আস্তে, সেই সময় পড়ায় মন বসে খুব।

সদর দরজাটা খোলা থাকে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। তাসের আড্ডা থেকে প্রায়ই একদম শেষে ফেরে দোতলার রতনদা, সে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার আগে দরজা বন্ধ থাকলে কে বারবার খুলে দেবে? একতলায় রণুরা ভাড়াটে, দোতলায় বাড়িওয়ালা, তিনতলায় আরও দুজন ভাড়াটে। দরজা খুলতে হবে তো একতলার লোকদেরই। দাদা বলে দিয়েছে, ও সব হবে না। চোর তো এখনো ঢোকে নি একদিনও! আগে ঢুকুক, তারপর দেখা যাবে।

রাত্তিরে কে কখন বাড়ি ফেরে, তা ঘরে বসে বসেই চটি কিংবা জুতোর আওয়াজ শুনে রণু বুঝতে পারে। টিউশানি সেরে বাবা ফেরেন প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটায়। দাদা যেখানেই যাক, ঠিক এর পাঁচ দশ মিনিট আগে ফিরে আসবেই, আর এমন ভাব দেখাবে যেন সন্ধ্যে থেকেই বাড়িতে আছে। বাবা নিয়ম করে রেখেছেন,

রাত্তিরবেলা সবাইকে তাঁর সঙ্গে বসে খেতে হবে। এটুকু সময়ই বাবার সঙ্গে যা দেখা বা কথাবার্তা হয়। বাকি সারাদিন তিনি প্রায় বাড়িতেই থাকেন না।

বাবা ফেরার একটু পরেই ভারী জুতো মশমশিয়ে ফেরেন তিনতলার রমেনবাবু। সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন আস্তে আস্তে। ওঁর হার্টের অসুখ আছে, সিঁড়ি ভাঙা বারণ। কোথাও বাড়ি ভাড়া পেলেই উঠে যাবেন এখান থেকে। দোতলার রতনদার ভাই শিবুদার চলাফেরা ঠিক উল্টো। হাঁটার বদলে সব সময়ই দৌড়োয়। সিঁড়ি দিয়ে নামে হুড়মুড় করে, তারপরই দরজা পর্যন্ত প্রায় যেন ছুটে যায়। শিবুদা সন্ধ্যে থেকে রাত্তিরের মধ্যে অন্তত চার পাঁচবার বাইরে বেরোয় আর ফিরে আসে।

তারপর চটি ফট্‌ফটিয়ে ফেরে আর একজন। ইনি নতুন এসেছেন, তিনতলায় থাকেন। নতুন এসেছেন মানে কি, তিনতলায় শান্তিময় কাকার ঘরে কিছুদিন থাকবেন। নীলুবাবু না কি যেন নাম। শান্তিময় কাকা হঠাৎ কিছুদিনের জন্য ট্রান্সফার হয়ে গেছেন নাগপুরে।

রমেনবাবুর মেয়ে শিখাদিও এক একদিন বেশ দেরি করে ফেরেন। সব শেষে রতনদা আসে প্রায় নিঃশব্দে। খুব সাবধানে দরজার ছিটকিনি আর খিল লাগায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠে পা টিপে টিপে। রতনদার কাকা ঘুমিয়ে পড়েন আগেই, তিনি যেন ওর দেরি করে ফের টের না পান। কিন্তু যে রোজই দেরি করে ফেরে, তার এই সাবধানতার মানে কি ? রতনদার কাকা কি কোন একদিনও জেগে থাকেন না ? কিংবা তিনি ঘুমোবার আগে দেখে নেন না রতন ফিরেছে কিনা ?

রণুদের বাড়ির সবাই ফিরে গেলেও পাড়ার অন্যান্য বাড়ি শান্ত হতে অনেক দেরি হয়। এক একটা বাড়িতে দরজা জানালা বন্ধ হয় দড়াম দড়াম শব্দে। মান্তুদের বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ ঝগড়া-ঝাঁটি শোনা

যায়। ধ্রুবদাদের বাড়িতে একটা বাচ্চা কাঁদে। তারপর বারোটা আন্দাজ সব নিঝুম। রাস্তায় দু-একটা লোকের জুতোর শব্দ, টুকরো-টাকরা কথা আর নাইট গার্ডের লাঠির ঠক্ ঠক্।

রণু গভীর মন দিয়ে বই পড়ছিল এমন সময় তার কানের কাছে বিকট ভাবে হোঁয়াও শব্দ হল। দারুণ চমকে কেঁপে উঠল সে। ঠিক যেন একটা হুলো বেড়াল। কিন্তু তাকিয়ে দেখল, সানুদা। সানুদা ওকে ভয় দেখিয়ে হাসছে। মুখে পান, হাতে সিগারেট, সানুদার চোখে মুখে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য যেন রাতটা তার কাছে কিছুই না।

—কি রে রণু, পড়ছিস! এত রাত জেগে পড়ছিস?

সানুদার গলার আওয়াজ জড়ানো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্য রকম গন্ধ আসছে। সবাই জানে। সানুদা মদ খায়। ওদের বাড়ির অনেকেই খায়।

সানুদাদের বাড়িটা বিচ্ছিরি। কতদিন ওদের বাড়িতে রং হয় না। একটা জলের পাইপ ফাটা, সেটা দিয়ে ছচ্ছড় করে জল পড়ে রাস্তায়। ও বাড়ির মেয়েরা রাস্তার ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে চেঁচিয়ে। ঝগড়া করায় ও বাড়ির সবাই দারুণ ওস্তাদ। সানুদারা পাঁচ ভাই, এর মধ্যে শুধু সানুদাই বিয়ে করে নি। চার বছর আগে সানুদার বাবা মারা যাবার পরেই ভাইয়েদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গণ্ডগোল। শুধু ঝগড়া নয়, এ ওকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, বাপ তুলে গালাগাল দেয়, সারা বাড়িতে দাপাদাপি করার পরও বেরিয়ে আসে রাস্তায়। চিৎকারে সারা পাড়া কাঁপায়। ওরা মামলা করে না, পুলিশের কাছে যায় না, শুধু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। ওদের সবচেয়ে বড় ভাই মাধব সরকার, তিনি দারুণ পণ্ডিত, ডি. এসসি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। খুব নাম করা লোক। অথচ ঝগড়া করেন তিনিই সবচেয়ে বেশী, বাথরুমে কে বেশীক্ষণ থেকেছে, কে কার বারান্দায় পা দিয়েছে—এই সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া। তার ছেলে রঞ্জু তো একটা গুণ্ডা, ছুরি-ছোরাও চালায়। তার ভাইগুলো

কেউই লেখাপড়া শেখে নি। সানুদা স্কুল ফাইন্যালে গাড্ডু খেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

মাধব সরকারের মেয়ে মাস্তু এক ক্লাসে পড়ে রণুর সঙ্গে। আগে আগে রণু ওদের বাড়িতে যেত, এখন মা বারণ করে দিয়েছেন। ও বাড়িতে সবাই খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে। অন্যরা আড়ালে ঐ বাড়িটার নাম দিয়েছে পচা বাড়ি। ও বাড়ির লোকদের কাছে পাড়ার কেউ পুজোর চাঁদাও চাইতে যায় না।

কিন্তু সানুদার ওপর রাগ করা যায় না কিছুতেই। সানুদার দারুণ সুন্দর চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য, ফর্সা রং, মাথায় বাবরি চুল, ঠিক গল্পের বইয়ের ছবির রাজপুত্রের মতন। আবার লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে সানুদা যখন লাঠি নিয়ে তাঁর ভাইপো রঞ্জুকে তেড়ে যায়, তখন তাকে মনে হয় ডাকাত। সানুদা তার দাদাদের বলে শূয়োরের বাচ্চা, বৌদিদের বলে বস্তির মাগী। আরও কত খারাপ খারাপ গালাগাল যে তার মুখ দিয়ে বেরোয় তার ঠিক নেই। অথচ এই সানুদাই পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। সবাইকে ভাইটি বলে ডাকে, গলির মধ্যে ক্রিকেট নেট প্র্যাকটিস শুরু হলে সানুদা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর অনুনয় বিনয় করে বলে, আমাকে একবার ব্যাট করতে দিবি ভাইটি? একটু পরে পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলে, লাঞ্চ ব্রেক। যা, মটন চপ কিনে নিয়ে আয়।

সন্ধ্যের দিকে ফুরফুরে মদের নেশা করে এসে সানুদা পাড়ার মোড়ে দাঁড়ানো ছেলেদের বলে, আয়, আমরা একটা লাইব্রেরি করি, করবি? এ পাড়ায় একটা লাইব্রেরি নেই মাইরি। আমি টাকা দেবো।

রণু সানুদাকে দেখে ভাবল, এই রে!

সানুদা বলল, পাড়ার আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু তুই একলা জেগে পড়ছিস। তোর মতন ভাল ছেলে এ পাড়ায় একটাও নেই।

রণু বইটায় হাত চাপা দিল। বইটার নাম 'সাহারার বিভীষিকা'। আর পনেরো পাতা বাকি, শেষ হলেই রণু শুয়ে পড়ত।

—বাঙালরা পড়াশুনোয় ভাল হয়। ছাখ না, আমার তো কিছুই হল না। আমাদের ক্লাসে যে-কটা বাঙাল ছেলে ছিল, সবাই ভাল রেজাল্ট করত। তুই যদি স্কুল ফাইন্যালে টেনথের মধ্যে হতে পারিস রণু, তোকে আমি নিজে একটা সোনার মেডেল দেব।

—সান্নুদা—

—মাইরি বলছি, আমি কথা দিয়ে কথা রাখি। তোদের বাড়ির সবাই কত ভাল। তোর বাবা দেবতার মতন মানুষ···তোর মা, নতুন কাকীমা, আহা এত ভাল লোক, একবার এক গ্লাস জল চেয়েছিলাম, ছুটো নারকেল নাড়ু দিয়েছিলেন সঙ্গে—আর সব বাড়িতে শুধুই জল দেয়।

সান্নুদা এত জোরে জোরে কথা বলছে যে নিশ্চয় অন্য কেউ জেগে উঠবে। সান্নুদা কথা বলতে শুরু করলে তো থামবেই না। রণু হাই তুলল।

—তুই আর কতক্ষণ পড়বি?

—এই আর একটু বাদেই—

—পড় ভাইটি, তুই মন দিয়ে পড়, আমাদের মতন হতভাগা লোকের উচিত নয় তোর মতন ভাল ছেলেকে ডিসটার্ব করা—

হঠাৎ কথা থামিয়ে সান্নুদা চলে গেল। নিজের বাড়ির থেকে উল্টো দিকে। এত রাত্রে সান্নুদা কোথায় যায়?

রণু বইতে চোখ ফেরাল। এমন বই যে শেষ না করে কিছুতেই ছাড়া যায় না।

ছু'মিনিট বাদেই আবার ফিরে এলো সান্নুদা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, রণু ভাইটি, তোর ঘুম কি খুব গাঢ়?

—কেন?

—আমি খানিকটা বাদে, এই ছু-আড়াই ঘণ্টা পর যদি তোর নাম ধরে আস্তে করে ডাকি, তুই জেগে উঠতে পারবি না?

—কেন বলুন তো সান্নুদা?

—তোকে একটা জিনিস রাখতে দেব। আমার বাড়িতে সব তো চোর ছ্যাঁচোড়, কিছু রাখার উপায় নেই। আর যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, তাহলে হয়তো সবটাই—

সানুদা পকেট থেকে একটা দুমড়ানো মোচড়ানো খাম বার করল। তারপর ছেঁড়া জালের ফুটো দিয়ে সেটা গলিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোর কাছে রাখ না, ভাইটি। কিছু মনে করলি না তো। ফিরে এসে ডাকলে ফেরৎ দিয়ে দিবি, কেমন?

—এত রাত্রে তুমি কোথায় যাবে, সানুদা?

—সে আছে একটা জায়গা। তুই ঠিক বুঝবি না।

—কিন্তু এখন তো ট্রাম বাস কিছু চলে না।

—না চলুক, ট্যাক্সি চলে। তুই এটা তোর কাছে রেখে দে, ভাইটি।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সানুদা। খামটা বেশ ভারী, মুখটা খোলা। রণু দেখল, খামের মধ্যে একগাদা দশটাকার নোট। তার গা ছমছম করে উঠল। যদিও দরজা বন্ধ, তবু একবার দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল রণু। সানুদার কাছ থেকে এ রকম ভাবে টাকা রাখা তার অন্যায় হয়েছে নিশ্চয়ই। কিসের টাকা? সানুদা চাকরি-টাকরি কিছু করে না। তবু সিল্কের পাঞ্জাবী পরে আর যখন তখন টাকা ওড়ায়। এ সব টাকা কোথা থেকে পায় সানুদা?

রণু জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর গুণতে লাগল টাকাগুলো। একবার মনে হল সাতাশখানা, আর একবার আটাশখানা। পর পর চারবার গুণে সে নিশ্চিন্ত হল যে আটাশখানা দশটাকার নোট-ই আছে। কিন্তু সানুদা তো গুণে দিয়ে যায় নি! যদি সানুদা এসে বলে এর চেয়ে বেশী টাকা ছিল?

এত টাকা রণু কখনো চোখেই দেখে নি একসঙ্গে। দু-একদিন সে তার বাবা-মা'র মধ্যে কথাবার্তা শুনে বুঝেছে যে তার বাবা মাইনে পান সাড়ে পাঁচশো টাকা আর টিউশনিতে আড়াইশো। তার জন্য

বাবাকে সারা মাস দারুণ খাটতে হয়। আর সানুদা কিছু না করেই……।

সানুদা টাকাটা গুণে দেয় নি। যদি এসে বলে এর চেয়ে বেশী টাকা ছিল, যদি মাতাল অবস্থায় এসে বলে, তুই আমার টাকা চুরি করেছিস…তাহলে রণুর বাবা, দাদা সবাই মিলে রণুকে…না না, সানুদা সে রকম মানুষই নয়।

আর, যদি রণু এর থেকে একটা দশটাকার নোট সরিয়ে রাখে, সানুদা বুঝতে পারবে? সানুদা টাকা গোণে না। পকেট থেকে যখন দশটাকার নোট বার করে। একটা দশটাকার নোটের সঙ্গে আর ছ'টাকা যোগ করলেই একটা ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হয়। বিলুদের ছাদে খেলা হয়, রণুর র‍্যাকেট নেই বলে ও এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের কাছে একবার র‍্যাকেটের জন্য আবদার করেছিল রণু, মা বলেছিল, এ বছর নয়, সামনের বছর।

রণু একটা দশটাকার নোট বার করে আলোর দিকে উঁচিয়ে ধরে অশোকচক্র ছাপটা দেখল। তারপর সেটা আবার যত্ন করে ভরে রাখল খামের মধ্যে। যারা টাকা না গুণে দেয়, তাদের একদম বিশ্বাস নেই। ভিতরে ভিতরে তাদের হয়তো সব টাকা ঠিকঠাক গোণা আছে।

বইটা সম্পর্কে আকর্ষণ কমে গেছে এর মধ্যে। রণুর নিজের জীবনে এত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আগে হয় নি। তার কাছে এখন অনেক অনেক টাকা। এই টাকা নিয়ে এক্ষুনি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে পারে। সোজা আফ্রিকার সাহারায়—

তাড়াতাড়ি বাকি পাতা ক'টা শেষ করে রণু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। টাকার বাণ্ডিলটা রাখল বালিশের নীচে। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত একটা ছটফটানি। টাকার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বালিশের তলায় ঘড়ি রাখলে যেমন টিকটিক শব্দ শোনা যায়, তেমনি টাকাটাও যেন একটা শব্দ করছে।

একটু তন্দ্রা আসতে না আসতেই রণু আবার চমকে জেগে উঠছে। ক'টা বাজল? সান্নুদা কখন আসবে? রণুর ঘরে ঘড়ি নেই। একবার তার খেয়াল হল, জানালাটা সে বন্ধ করে রেখেছে, সান্নুদা এসে ডাকতে পারবে না। রণু উঠে আবার জানালাটা খুলে দিয়ে এলো।

তারপর এক একবার তন্দ্রা, এক একবার জেগে ওঠার পর এক সময় রণু সত্যি সত্যিই তার ঘুমের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু প্রথম ভোরের আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে বসল। ধড়মড়-করে হাত চলে গেল বালিশের তলায়। টাকাটা ঠিকই আছে। সান্নুদা আসে নি।

॥ দুই ॥

নীলাঞ্জন ঘরের তালার মধ্যে চাবি ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুটখাট করছে। তালাটা খুলছে না কিছুতেই। পরের বাড়ির তালা নিয়ে এই এক ঝামেলা। চাবি জিনিসটার যেন বেশ একটা আনুগত্য আছে। যার চাবি তার হাতেই ঠিকঠাক খোলে। কুকুরের মতন চাবিও যেন মানুষের পোষ মানে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তালাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কে যেন বলল, আপনার কাছে দেশলাই আছে ?

নীলাঞ্জন পিছন ফিরে দেখল, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের রমেনবাবু। অত বড় ভারিক্কী রাসভারী লোকটি যে নীলাঞ্জনের মতন একটি নেহাৎ ছোকরার কাছে দেশলাই চাইবেন, এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। একটু অবাক হয়ে নীলাঞ্জন পকেটে হাত ভরে তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে, এই নিন না—

দেশলাইটা দিয়ে নীলাঞ্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে আলো জ্বালল। বিনা আহ্বানেই রমেনবাবু ঢুকে এলেন ঘরের মধ্যে। একটা চেয়ার টেনে বসলেন। নীলাঞ্জনের একটু লজ্জা করতে লাগল। ঘরটা বড্ড অগোছালো হয়ে আছে। সকাল বেলা বেরুবার সময় নীলাঞ্জন নিজের পাজামা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া ছুড়ে ছুড়ে ফেলে রেখেছিল বিছানার ওপর। ঘরের মেঝেতে কাগজপত্র ছড়ানো।

নীলাঞ্জন দ্রুত হাতে গোছাতে লাগল।

রমেনবাবু ষড়যন্ত্র করার মতন ফিসফিস করে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিন না।

নীলাঞ্জন একটু অবাক হয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রমেনবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে নীলাঞ্জনকে বললেন, নিন! এই ব্র্যাণ্ড চলে তো?

রমেনবাবু নীলাঞ্জনের প্রায় বাবার বয়েসী। এখনো এই বয়েসী লোকদের সামনে পড়ে গেলে সে সিগারেট লুকোয়। সে একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু উনি নিজে থেকেই যখন দিচ্ছেন, তখন আর ন্যাকামি করে লাভ নেই। হাত বাড়িয়ে নীলাঞ্জন একটা সিগারেট নিল।

সিগারেট ধরিয়ে রমেনবাবু একটু হেসে বললেন, আমার সিগারেট খাওয়া বারণ তো তাই নিজের ঘরে বসে খেতে পারি না। বাড়ির সবাই এখন আমার গার্জেন হয়ে গেছে।

—সিগারেট খাওয়া বারণ কেন? আপনার অসুখের জন্য?

—হ্যাঁ মশাই। আমি হার্টের রুগী। সিগারেট নাকি খুব ক্ষতি করে।

তাহলে রমেনবাবু লুকিয়ে তার ঘরে সিগারেট খেতে এসেছেন। নীলাঞ্জন সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু নীলাঞ্জন কী করতে পারে? ঐ রকম একজন বয়স্ক লোককে সে কি করে বারণ করবে, আপনি সিগারেট খাবেন না! ওঁর নিজের ভাল মন্দ উনি নিজেই তো বোঝেন।

রমেনবাবু বললেন, আপনাকে সিঁড়িতে দেখি মাঝে মাঝে। কিন্তু ভাল করে আলাপ হয় নি। তাই ভাবলাম, আলাপটা করে আসি। শান্তিময়বাবু যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, ওঁর ফ্ল্যাটে ওঁর এক ভাই এসে থাকবে। আপনি শান্তিময়বাবুর নিজের ভাই?

—না। উনি আমার এক মাসতুতো দাদার বন্ধু, খুব ছেলেবেলা থেকে চেনা। অনেকটা নিজের দাদারই মতন।

—উনি তো মাস দুয়েকের মধ্যেই ফিরবেন?

—সেই রকমই তো কথা আছে।

—তা আপনি এখানে একা একা থাকেন, আপনার আর কেউ……

—আমাদের নিজেদের বাড়ি গোয়াবাগানে। নিজেদের বাড়ি মানে অবশ্য সেটাও ভাড়া বাড়ি। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, জায়গা কম। শান্তিময়দা কিছুদিনের জন্য নাগপুরে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন, তাই আমাকে বললেন, এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে গেলে ফিরে এসে আবার ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে, তাই এটা ছাড়বেন না।

—সে তো ঠিক কথা। একবার ফ্ল্যাট ছাড়লে আবার যদি নতুন একটা পাওয়াও যায়, ডবল ভাড়া—

—শান্তিময়দা বললেন, ওর ফ্ল্যাটটা এই দু'মাস পাহারা দেবার জন্য একজন লোক খুঁজছেন। আমি তাই রাজি হয়ে গেলাম। এই দু'মাস একটু নিরিবিলিতে থাকব।

—একা একা থাকতে ভাল লাগে ?

—আমার লাগে।

—ইয়ংম্যান। এখন আপনাদের সব কিছুই ভাল লাগবে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া ?

—দুপুরে বাইরে খাই। রাত্তিরে একবার নিজেদের বাড়ি ঘুরে একদম খেয়ে দেয়ে আসি।

—কিন্তু সকালের চা-টা ?

—সে ব্যবস্থা এখানেই করে নিয়েছি।

—কিছু অসুবিধে হলে বলবেন। এখন এক কাপ চা খাবেন ?

—না না, আমি বেশী চা খাই না।

—আমিও খেতাম না আগে। কিন্তু এই অসুখটা হবার পর থেকে খুব লোভ বেড়েছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নানারকম জিনিস খেতে ইচ্ছে করে। এক একদিন সাধ যায়, রাস্তায় পার্কে ঢুকে, ঐ যে ফুচ্‌কা না কী বলে, আমাদের সময় আমরা বলতাম জল কচুরি, সেগুলো খাই। হে-হে-হে।

বাইরে থেকে সরু রিনরিনে গলায় একটা ডাক শোনা গেল, বাবা, বাবা, তুমি কি ছাদে ?

রমেনবাবু একদিকের ভুরু তুলে বললেন, ঐ যে আমার গার্জেনরা আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। আমার ছোট মেয়ে রিংকু, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আলাপ হয়েছে ?

নীলাঞ্জন বলল, না।

—সে কি! আপনি একজন ইয়াংম্যান, আপনার সঙ্গে এখনো ইয়াং গার্লদের আলাপ হয় নি! আজকাল তো সবাই নিজেরা নিজেরাই আলাপ করে নেয়।

নীলাঞ্জন চুপ করে রইল।

—উঠি তাহলে ?

উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমেনবাবু একটু ইতস্তত করলেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা নীলাঞ্জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা আপনার কাছে রাখুন!

—না না। আমার আছে।

—রাখুন না! আমার পকেটে সিগারেট পেলে সবাই মিলে আবার চ্যাঁচামেচি শুরু করবে। সবাই আজকাল আমার পকেট সার্চ করে। অনেকদিনের অভ্যেস, ছাড়তেও পারি না!

নীলাঞ্জন চুপ। তাঁর মেয়ে আরও দু'বার ডাকতেই রমেনবাবু দরজাটা একটু খুলে বললেন, ওরে আমি এখানে। দাঁড়া, এক্ষুনি যাচ্ছি।

তারপর নীলাঞ্জনের দিকে আবার ফিরে বললেন, যাক্ আলাপ হল, আসব মাঝে মাঝে। বাড়িউলি যে আপনাকে থাকতে দিয়েছে, সেটাই বড় আশ্চর্যের।

—কেন ?

—সাধারণত কোন ব্যাচিলরকে কেউ এ সব পাড়ায় একা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে দেয় না।

—কিন্তু আমি তো মাত্র দু'মাসের জন্য—

—তাও দেয় না। ফ্যামিলি ম্যান ছাড়া ভাড়াই দেয় না। কোন আপত্তি করে নি বাড়িউলি ?

—না। আমাকে তো কিছু বলেন নি। আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখাই হয় নি!

—তাই তো আশ্চর্য হচ্ছি। লোক ভাল নয়। বড় স্বার্থপর। আমি তো এখানে আছি বিশ বছর। বেলেঘাটায় দু'বছর আগে নিজে একটা বাড়ি কিনেছি। কোম্পানি লীজে ভাড়া আছে এখন। এ বাড়ি ছেড়ে যাই না কেন জানেন ? এ বাড়িতে থেকেই আমার যা কিছু উন্নতি। এখন বাড়ি পালটালে যদি লাক কেটে যায় ?

আর একবার 'বাবা' ডাক উঠতেই রমেনবাবু 'চলি' বলে বেরিয়ে গেলেন।

নীলাঞ্জন দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। ভদ্রলোক একটু বেশী কথা বলতে ভালবাসেন। সিগারেটটা এখানে রেখে যাবার মানে হল, উনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে এখানে এসে সিগারেট খেয়ে যাবেন। এ তো এক ঝামেলা হল! বয়স্ক লোকদের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না নীলাঞ্জনের।

এ বাড়ির কারুর সঙ্গেই নীলাঞ্জনের তেমন পরিচয় হয় নি এখনও। সে চুপচাপ নিরিবিলিতেই থাকতে চায়। তবু এই ক'দিনে বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা হয়ে গেছে। একতলায় থাকে এক ইস্কুল মাস্টারের পরিবার। সাধারণ নিরীহ লোক। দোতলায় বাড়িওয়ালা। বাড়িওয়ালা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, তাঁর স্ত্রীই এখন মালিক। বাড়িওয়ালার বিপত্নীক ভাইও এ বাড়িতে থাকেন। তিনতলায় রমেনবাবু ভাড়াটে হয়েও বাড়িওয়ালাদের চেয়ে বেশী অবস্থাপন্ন। একমাত্র তাঁরই নিজস্ব গাড়ি আছে। বেলেঘাটায় রমেনবাবুর নিজস্ব বাড়ি থাকতেও এখনো এখানে ভাড়াটে হয়ে রয়েছেন। হার্টের রুগী, তবু তিনতলায় ওঠা-নামা করেন। নিশ্চয়ই

লোকটি খুব কঞ্জুষ। টাকার জন্য মানুষ নিজের হৃদয়কেও অবহেলা করতে পারে?

রমেনবাবুর ছেলে নেই, তিন মেয়ে। একটি মেয়েরও এখন পর্যন্ত বিয়ে হয় নি। কেন, কে জানে!

নীলাঞ্জন জামা কাপড় ছেড়ে নিল তাড়াতাড়ি। রাত সাড়ে দশটা বাজে। এর মধ্যেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে এসেছে। শান্তিময়দার এই ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। সবই এখন নীলাঞ্জনের এক্তিয়ারে। চিরকাল একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়েছে তাকে। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শান্তিময়দাকে অজস্র ধন্যবাদ। এই দু'মাসে সে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলবে। প্রথম সাতদিনেই কুড়ি পাতা লেখা হয়ে গেছে।

লেখার লম্বা খাতাটা নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুকে বালিশ দিয়ে লিখতে সে ভালবাসে। কিন্তু এক পাতা লেখার আগেই তার ঘুম এসে গেল। সওয়া বারোটা বাজে। নীলাঞ্জন চোখ কচলালো। একটু গরম চা খেলে আরও ঘণ্টা দু-এক জেগে লেখা যেত। রান্নাঘরে স্টোভ, চা, চিনি সবই আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে নিজে নিজে বানাতে আলস্য লাগে। কাউকে হুকুম করা গেলে বেশ হত।

গরমও লাগছে খুব। পাখার হাওয়াটাও যেন গায়ে লাগছে না। উত্তর কলকাতায় পুরোনো পাড়ার বাড়ি, চারপাশটা বড় ঘিঞ্জি। এ বাড়িটার তিনতলায় অবশ্য আলো হাওয়া বেশ ভালই আসে। কিন্তু দু'দিন ধরে অসহ্য গুমোট চলছে।

দরজা খোলা রেখে নীলাঞ্জন ফ্ল্যাটের বাইরে চলে এলো। ওপরেই বেশ বড় ছাদ। ছাদে একটুক্ষণ পায়চারি করলে ঘুমটা কেটে যাবে। রাত দুটো পর্যন্ত অন্তত জেগে লিখতে পারলে অনেকটা এগিয়ে যাবে। ফাঁকা ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগটা নীলাঞ্জন ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চায় না।

আকাশে আজ চাঁদ নিরুদ্দেশ। কোন্ তিথি কে জানে, সারা আকাশ জোড়া অন্ধকার। তবু সারা পৃথিবী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়।

রাস্তাঘাট থেকে আলো উঠে আসছে ওপর দিকে। পৃথিবীর কোথাও নাকি খাঁটি অন্ধকার দেখা যায় না। এ কথা বলেছিল চাঁদের এক অভিযাত্রী। নীল আর্মস্ট্রং বা আর কেউ। চাঁদের এক পিঠে থাকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অভিযাত্রী বুঝেছিল, পৃথিবীতে এ রকম নিকষ কালো সে দেখে নি কোনদিন।

আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর বাদে মানুষ নিশ্চয়ই নিয়মিত যাতায়াত করবে চাঁদে। কোন একটা সুযোগ পেলেই নিশ্চয়ই সেখান থেকে একবার ঘুরে আসবে নীলাঞ্জন। বিশেষত সেই খাঁটি অন্ধকার দেখে আসার জন্য।

সিগারেট দেশলাইটা আনতে পারলে ভাল হত, পায়চারি করতে করতে এই কথাটা মনে হল নীলাঞ্জনের। সিগারেটের ধোঁওয়ায় বুদ্ধি খোলে। সে তার জীবনের প্রথম উপন্যাস লিখছে। পর পর অনেক ঘটনাই মনে আসে, কিন্তু ঠিক কোন্‌টার পর কোনটা লিখবে, সেটা ঠিক করাই শক্ত।

হঠাৎ নীলাঞ্জন একটা শব্দ শুনে চমকে গেল। মানুষেরই শব্দ। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রথমে চারদিকে তাকিয়েও সে কিছু দেখতে পেল না। অনিচ্ছা সত্বেও নীলাঞ্জনের গা টা একটু ছমছম করে উঠল। মাঝরাত্তিরে অশরীরী কান্না শুনলে এ রকম হবেই। নীলাঞ্জনের কোন রকম আলৌকিকে বিশ্বাস নেই যদিও।

কিন্তু মধ্যরাত্রির কান্নার সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা বহু রূপকথার কাহিনী জড়িত। এই সময় কাঁদে শুধু রাজকন্যারা আর রাক্ষসীরা।

অন্ধকারে খানিকটা চোখ সইয়ে নেবার পর দ্বিতীয়বার সে রকম শব্দ হতেই সে দেখল যে রাস্তার দিকের পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সে কালো কিংবা নীল শাড়ি পরা।

নীলাঞ্জন থমকে দাঁড়াল। এ বাড়িরই কোন মেয়ে। এত রাত্রে সে যখন একা একা কাঁদছে, নিশ্চয়ই তার দুঃখটা বড় তীব্র। নীলাঞ্জনের কষ্ট হল। মানুষ শুধু শুধু দুঃখ পায় না, একজন আর

একজনকে দুঃখ দেয়। কেন মানুষ অন্যকে দুঃখ দেয়? কতখানি ব্যথা পেলে একটি মেয়ে এ রকম একা একা কাঁদতে আসে ছাদে।

এ বাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে নীলাঞ্জনের আলাপ হয় নি। সে কি এখন মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে, কী তোমার দুঃখ? মেয়েটি যদি ভয় পায়, যদি সে ভাবে নীলাঞ্জনের কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে। যদি মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ভয় পেয়ে, কেউ আজ নীলাঞ্জনকে বিশ্বাস করবে না।

নীলাঞ্জনের উচিত এখন চুপি চুপি নীচে চলে যাওয়া। তবু সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন চুম্বক তার পা আটকে ধরেছে।

প্রত্যেক কান্নার পিছনেই একটা না একটা গল্প থাকে। মধ্য রাত্রে অন্ধকারে একা একা একটি মেয়ের কান্নার দৃশ্যটি রীতিমত নাটকীয়। সচরাচর কেউ দেখতে পায় না। নীলাঞ্জন একজন লেখক, এই কান্নার কাহিনী জানার জন্য তার দুর্দমনীয় কৌতূহল জেগে উঠল। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছে না, সে ঠিক ভীরু না হলেও লাজুক।

নীলাঞ্জন একবার ভাবল এগিয়ে যাবে। কিন্তু এগোল না। তারপর ভাবল মুখ দিয়ে একটা কিছু শব্দ করে সে তার উপস্থিতি জানান দেবে। তাও করল না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল স্থির ভাবে।

মেয়েরা পিঠ দিয়েও দেখতে পায়। পিছন দিক থেকে কোন পুরুষ তাকিয়ে থাকলেও তারা টের পেয়ে যায় ঠিক। এই মেয়েটিও হঠাৎ ফিরে তাকাল এবং নীলাঞ্জনের লম্বা চেহারাটা দেখতে পেয়ে গেল।

মেয়েটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল না। গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুল না। নীলাঞ্জনকে সে চিনতে পেরেছে নিশ্চয়ই, চোর বা ভূত ভাবে নি। মেয়েটি কোন কথাই বলল না, ধীর পায়ে হেঁটে গেল সিঁড়ির দিকে। মুখটা অন্য দিকে ফেরানো। কিন্তু নীলাঞ্জন তাকে চিনতে পারল না।

।। তিন ।।

—রেডিওটা বন্ধ করুন !

দোতলা থেকে শিবু চিৎকার করে উঠল। রণুর দাদা বরেণ সেটা শুনেও শুনল না। শুধু তার ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল। বই নিয়ে সে শুয়ে আছে বিছানায়। টেবিলের ওপর রেডিও বাজছে।

শিবু আবার চ্যাঁচাল, রেডিওটা একটু বন্ধ করুন !

বরেণ এবার উঠে গিয়ে রেডিওর ভল্যুমটা একটু বাড়িয়ে দিল। তিন ব্যাণ্ডের রেড়িও, জোরে চালালেই একটা খ্যানখেনে আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও শিবু আর বরেণ দারুণ বন্ধু ছিল। ছুটির দিনের দুপুর বেলা ওরা ছাদে গিয়ে ট্যাঙ্কের ধারে বসে গল্প করত। গনগনে রোদ, ওরই মধ্যে ট্যাঙ্কের ধারের ছায়াটুকুতে ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসলে বেশ আরাম। শিবুই বরেণকে সিগারেট খাওয়া শেখায় প্রথম। নিজের পয়সায় সিগারেট কিনে সে বরেণকে খাইয়েছে। নারী পুরুষ সংক্রান্ত যৌন জ্ঞানের শিবুই শিক্ষাদাতা।

কিন্তু গত ছ'মাস ধরে দুজনের কথা বন্ধ। শিবুরা বাড়িওয়ালা, বরেণরা ভাড়াটে। শিবুর মা কোন কারণে বরেণের ওপর রেগে গেলে এখনও বলেন, ভাড়াটেদের ছেলে ! ভাড়াটেদের ছেলের এত আস্পর্ধা !

যেন ভাড়াটেরা একটা নীচু জাত !

মাস ছয়েক আগে বাড়িওয়ালারা বরেণদের নামে মামলা করেছে। বছর পাঁচেক আগেও একবার মামলা হয়েছিল, তাতে বাড়িওয়ালারা

হেরে যায়। এবার নতুন নতুন শাণিত যুক্তি দিয়ে মামলা ঠোকা হয়েছে। এবার জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট। বরেণরা পনেরো বছর ধরে ভাড়াটে রয়েছে. ওদের ওঠাতে পারলে একতলাটার এখন তিনগুণ ভাড়া হবে।

বরেণের বাবা স্কুল মাস্টার, বরেণরা গরীব। সুতরাং বাড়িওয়ালা পক্ষ ওদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেই। কিন্তু তিনতলার রমেনবাবুকে নিয়ে আবার অন্য মুশকিল। তিনি ভাড়াটে হয়েও বাড়িওয়ালাদের চেয়ে বেশী বড়লোক। তিনি গাড়ি চড়েন। তাঁর ঘরে টি-ভি আছে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন জুতো মশমশিয়ে। বাড়িওয়ালাদের দিকে তিনি অবজ্ঞার চোখে তাকান। রমেনবাবুরা যখন প্রথম এ বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন, তখন তাঁদের অবস্থাও ছিল খুব সাধারণ। কিন্তু গত কয়েক বছরে রমেনবাবু দারুণ উন্নতি করেছেন ব্যবসায়। তিনি তাঁর বেলেঘাটায় নিজের বাড়ি বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে এখানে কম ভাড়ায় থাকেন। তাঁর সঙ্গেও মামলা হয়েছিল, সুবিধে হয় নি।

বাড়িওয়ালা পক্ষের সঙ্গে একমাত্র শান্তিময়দেরই সদ্ভাব আছে। শান্তিময়বাবু মাত্র দু'বছর আগে ভাড়া এসেছেন, তিনি অনেক বেশী ভাড়া দেন।

যখনই মামলা লাগে, তখনই শিবু কথা বন্ধ করে দেয় বরেণের সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে নেয় চোখাচোখি হলেই। অবশ্য কয়েক মাস বাদে সে নিজে থেকেই এসে আবার ভাব করবে।

শিবু রবীন্দ্রসঙ্গীত একেবারে পছন্দ করে না। তার মতে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু ঘ্যানঘ্যানানি আর প্যানপ্যানানি। পড়াশুনোর সময় রেডিওতে ঐ গান বাজলে তার খুবই ব্যাঘাত হয়।

বরেণ রেডিওটা বন্ধ করল না দেখে শিবু একটা প্রতিশোধ নিল। সে তাদের খাবার ঘরের পাখাটা চালিয়ে দিল তক্ষুনি। এই পাখাটার কিছু দোষ আছে। এটা ডি-সি এরিয়া, খারাপ পাখা চালালেই কাছাকাছি রেডিওগুলোতে বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হয়। নীচতলায়

বরেণের ঘরে সুচিত্রা মিত্রের গানের মধ্যে ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং শব্দ হতে লাগল।

শিবু এতেও ক্ষান্ত হল না। পাখাটার রেগুলেটার সে একবার কমাতে একবার বাড়াতে লাগল। সুতরাং ঘট ঘটাং শব্দটা একবার আস্তে একবার জোরে। সুচিত্রা মিত্র এ সব কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি গেয়েই যাচ্ছেন।

বরেণ বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিল রেডিও। দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, শালা!

এবার হার হল বরেণের। অন্য কোন কায়দায় সে শিবুকে আবার ল্যাং মারার চেষ্টা করবে।

শিবুর দিদি অনিতা বলল, এ কি, তুই রেগুলেটার নিয়ে অমন করছিস কেন?

শিবু চোখ মটকে বলল, ভ্যাখ না, নীচের বরেণটাকে কেমন টাইট দিচ্ছি।

—পড়াশুনো ছেড়ে এই সব করবি?

—তুমি যাও না দিদি, নিজের কাজ কর। আমার পড়াশুনো নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

অনীতা আর শিবু পিঠোপিঠি ভাই বোন। পাঁচ সাত বছর আগেও শিবু মুখে মুখে কোন কথা বললেই অনীতা তার মাথায় চাঁটি লাগাত। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন শিবু কথায় কথায় মুখ ঝামটা দেয়, অনীতা চুপ করে থাকে।

বিয়ের মাত্র দেড় বছর পরেই অনীতা রাগ করে তার স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছে। তার স্বামী তাকে নিতেও আসে না। তার স্বামী একজন দাঁতের ডাক্তার, প্রকাশ্যেই সে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে থাকে।

নিজের বাড়িতেও অনীতা আর আগের মতন সহজ ব্যবহার করতে পারে না। কখনো কখনো অন্যদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে করতে

হঠাৎ থেমে যায়। রেডিওতে কোন গান শুনতে শুনতে আপন মনে কেঁদে ফেলে। অনীতা আর আগের মতন নেই।

রেডিও বন্ধ হবার পর শিবু আবার যেই পড়ার ঘরে গেল, অমনি নীচতলায় বরেণ একটি নতুন কাণ্ড শুরু করল। রেডিও বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে তার গলার জোর নেই? সে আবৃত্তি কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়।

সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল;

স্থচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এ পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।
আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ······

ওপরতলায় বসে শিবু খানিকক্ষণ শুনল। নীচতলা থেকে কেউ এ রকম গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচালে কি পড়াশোনা হয়? শিবু একটুও আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। পড়াশুনোয় তার মন বসে না এমনিতেই, তার ওপর বরেণটা যদি এ রকম শত্রুতা করে, তাহলে তো একদমই পড়াশুনো হবে না।

বই মুড়ে রেখে সে চটি ফটফটিয়ে নেমে এলো নীচে। বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে সে বরেণের ঘরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য ছুড়ে গেল, একটা গাধা ঢুকে পড়েছে বাড়ির মধ্যে। ধোপারা খুব খোঁজা-খুঁজি করছে।

বরেণ যেন উত্তর দেবার জন্য তৈরিই হয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে বলল, মা, শিবু ধোপা আজ এসেছিল?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, কি হচ্ছে কি, বড় খোকা? দরজা বন্ধ করে দিয়ে পড়াশুনো কর।

বরেণ আবার বলল, শিবু ধোপা আসে নি আজ? আমার একটাও শার্ট কাচা নেই!

শিবু রাগের চোটে দড়াম করে বন্ধ করল সদর দরজা। বরেণদের ধোপার নাম সত্যিই শিবু।

শিবু মোড়ের দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনে তক্ষুনি আবার ফিরে এলো। এবার সে পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট খাবে। জানালা দিয়ে সেই ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়ে নীচে বরেণের ঘরে ঢুকবে। আর তখন ছটফট করবে বরেণ। শিবু যে সিগারেট খায়, তা বাড়ির লোক জানে। একটুখানি আড়াল রাখলেই হল। বরেণের উপায় নেই বাড়িতে বসে সিগারেট খাওয়ার।

বরেণ দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল। সিগারেটের ধোঁয়া নাকে এলে তারও ইচ্ছে করে সিগারেট খেতে। কিন্তু উপায় নেই। শিবুই তাকে সিগারেট খেতে শিখিয়েছে। এখন সে-ই প্রতিশোধ নিচ্ছে! কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করল বরেণ। তারপর সে বিড়বিড় করে বলল, হারামীর বাচ্চা, দ্যাখ না, আমি তোমাকে কাল কেমন ভাবে টাইট দিই!

বন্ধ ঘরের মধ্যে বরেণ প্রাণ খুলে আরও অনেক বাছা বাছা খারাপ গালাগালি দিতে লাগল শিবুকে।

আজকের খেলাটায় জিতে গিয়ে শিবু খুব খুশি। নিজেকে সে এমনই তারিফ করতে লাগল যে পড়াশুনোয় মন বসার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঘরের দরজা বন্ধ। সে সন্তর্পণে বার করল আলমারির মাথা থেকে একটা পাতলা ইংরেজি বই। ভিতরে আট-দশখানা ছবি। সেগুলো দেখলেই গা গরম হয়ে ওঠে। আপন মনে উৎফুল্ল ভাবে সে বলল, বরেণ শালা একবার বইখানা চেয়েছিল। ওকে বই দেব না আমার ইয়ে দেব!

বরেণের বোন সুতপার সঙ্গে কিন্তু শিবুর দিদি অনীতার ঝগড়া নেই। দুখানা বই কোলে নিয়ে অনীতা নেমে এলো নীচে। ওদের শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, সুতপা, সুতপা!

সুতপা তখন রণুর ঘরে। দু'দিন ধরে আবার রণুর খুব জ্বর। সে চোখ বুজে তক্তপোষে শুয়ে আছে, কপালে জলপটি দেওয়া। সুতপা পাশে বসে বসে বই পড়ছে, আর মাঝে মাঝে ছোট ভাইয়ের জলপটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অনীতার ডাক শুনে সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

অনীতা বলল, এই নে তোর বই দুখানা। তোর কাছে আর বই আছে?

সুতপা শোওয়ার ঘরে ঢুকে বলল, দেখছি। এসো না অনীতাদি, একটু বসো। রণু ঘুমোচ্ছে।

—রণুর বুঝি আবার জ্বর হয়েছে? বড্ড ভোগে ছেলেটা!

—কথা বললে কথা শোনে না। যা-তা জিনিস খাবে—

অনীতা কিন্তু ওদের ঘরে ঢোকে নি, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলছে।

—বসবে না অনীতাদি?

—না রে। কাজ আছে একটা, আজ আমি চিংড়িমাছ দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধব বলেছি। কাকাবাবু অনেক দিন ধরে খেতে চেয়েছেন। তাই আজ আমি নিজেই রাঁধছি। এর পর তো আর বেশী সময় পাব না।

—সময় পাবে না? ওঃ, তুমি চলে যাবে বুঝি?

—সামনের মাস থেকে আমি একটা চাকরি পাচ্ছি। একটা মিশনে, সুপারভাইজারের কাজ—

—বাঃ, কি করে পেলে?

—চেনাশুনো একজনের থ্রু দিয়ে।

—তখন তুমি এখানেই থাকবে, না চলে যাবে?

—বোধহয় চলেই যাব···মিশনে আমার থাকবার জন্যে ঘর পাওয়া যাবে—

সুতপা একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনীতার দিকে। অনীতাদি তাহলে স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না? অনীতাদি স্বামীর কথা উচ্চারণ করেন না। নিজে থেকে কিছু না বললে যে অনীতাদিকে স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, সে কথা সুতপা বোঝে।

অনীতার চেহারা মোটামুটি ভালই। হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিল। নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করে বিমলদাকে। বাড়ির অমত ছিল সেই বিয়েতে, তবু অনীতাদি জোর করে বিয়ে করেছে। সেই বিমলের সঙ্গে তার বনিবনা হল না, বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হল। এই নিয়ে তার মনের মধ্যে একটা ঘোর লজ্জা আছে। তার মা কিংবা ভাইরা যখন খোটা দিয়ে বলে, আমরা মানুষ চিনি না? তখন অত বারণ করেছিলাম। তখন লজ্জাসরম খুইয়ে নিজে নিজেই···

রতনদা একবার তার ভগ্নীপতি বিমলদার কাছে গিয়ে মামলার ভয় দেখিয়েছিল। বিমলদা যেন কিছুই জানেন না। অবাক হবার ভান করে বলেছিলেন, মামলা? কেন? তোমার বোনকে কি আমি তাড়িয়ে দিয়েছি? কোনদিন কম আদর-যত্ন করি নি, খাওয়া পরার অভাব নেই। তবু সে রাগ করে চলে গেলে আমি কি করব? এখনো আমার দরজা খোলা আছে, সে ফিরে এলে আবার যেমন ছিল তেমনি থাকবে। আসলে তোমার বোনের মেজাজ বড় সাংঘাতিক। পান থেকে চুন খসলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। আমি কোনদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি না, কিন্তু সে তবু প্রত্যেক দিন আমি বাড়ি ফিরলেই···

রতন বলেছিল, কিন্তু আপনি···

—কি আমি?

—আপনি······

—আপনি আপনি করছ কেন? কি বলতে চাও বল না!

না, সে কথাটা শেষ পর্যন্ত বলতে পারে নি রতন। বিমলদার সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের কি সম্পর্ক আছে, সে কথা চট করে সে উচ্চারণ করতে পারল না। সে মেয়েটিকে তো বাড়িতে এনে রাখেন নি বিমলদা। বাড়ির বাইরে অনেকেই অনেক কিছু করে।

বিমলদা দারুন চালু লোক। তাঁর সঙ্গে কথায় পারা খুব শক্ত। মামলা করলেই বা কী লাভ হবে। সত্যিই তো বিমলদা স্ত্রীকে কোন রকম অযত্নে রাখেন নি। বাড়িতে ঝি-চাকর আছে। সংসার খরচ ছাড়াও শুধু শুধু হাতখরচ হিসেবে প্রতি মাসে তিনি পাঁচশো টাকা দিতেন নিজের স্ত্রীকে। এর ওপর কারুর কিছু বলার থাকতে পারে? তিনি তাঁর চেম্বারের নার্সকে শয্যাসঙ্গিনী করেন মাঝে মাঝে, এ ব্যাপারটা অনেকে জানলেও কোর্টে কি প্রমাণ করা যাবে?

রতন বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল বিমলদা মানুষটি তো খারাপ নয়। এখনো চান অনীতাকে ফেরৎ নিতে, ও যদি যায়···

এই নিয়ে রতনের সঙ্গে অনীতার হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। অনীতা চায় না, তার স্বামীর কাছে কেউ বোঝাপড়ার জন্য যায়। সে নিজেই নিজের ভার নিতে পারবে।

সুতপা আর দুটো-তিনটে গল্পের বই এনে দিল। সবই অনীতার পড়া। শেষ পর্যন্ত সে একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে উঠে গেল ওপরে।

দোতলার সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন অনীতার কাকা। দারুণ রাশভারী লোক। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, বিয়ে করেন নি। চাকরি-বাকরিও করেন নি কখনো। এক সময় দেশের কাজ করতে গিয়ে জেল খেটেছিলেন। কাকাবাবু বাড়ির কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না। সকাল বিকেল দু'বার বেরিয়ে তিন তিন ছ' মাইল রাস্তা হেঁটে আসেন শরীর সুস্থ রাখবার জন্য। বাকি সময়টা ঘরে বসেই কাটান। তবু পরিবারের সবাই ভয় পায় কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু এক সময় হাতিবাগান বাজারের কাছে খুব চালু একটা ইলেকট্রিকের দোকান কিনে নিয়েছিলেন, সেটা আবার লীজ দিয়েছেন এক বন্ধুকে। প্রতি মাসে তিনি দেড় হাজার টাকা করে পান। তার থেকে বিশেষ কিছু খরচ হয় না। এ বাড়িটারও অর্ধেক অংশের মালিক তিনি, কিন্তু কোনদিন সে নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি, ভাড়ার টাকার অংশও চান না।

সেই জন্যই কাকাবাবুর বিশেষ খাতির এ বাড়িতে। ঠিক ঘড়ি ধরে তাঁর স্নানের জল দেওয়া হয়, কক্ষনো তাঁকে ঠাণ্ডা খাবার দেওয়া হয় না। তিনি যখন বাড়িতে থাকেন, তখন জোরে কথা বলে না কেউ। পানের সঙ্গে জর্দা খেতে ভালবাসেন কাকাবাবু, তাই রতন বড়বাজার থেকে ওঁর জন্য বিশেষ রকমের জর্দা এনে দেয়। শিবু অতি ভক্তিতে কাকাবাবুকে বলে 'ক্যাকাবাবু'। ওরা সবাই আশায় আশায় আছে। উনি চোখ বুজলেই ওঁর জমানো টাকাগুলো নিজেরা ভাগ করে নিতে পারবে।

অবশ্য খুব নিয়মে আর যত্নে থাকার ফলে কাকাবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিনই যেন ভাল হচ্ছে। হঠাৎ চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই।

অনীতা কাকাবাবুর ওপর খুব কৃতজ্ঞ। বিমলের সঙ্গে বিয়ে হবার সময় একমাত্র তিনিই কোন বাধা দেন নি। কাকাবাবুর ভরসাতেই অনীতা জোরের সঙ্গে অতখানি এগোতে পেরেছিল। বিমলের হৃদয় বলে কিছুই নেই। আছে শুধু কথা। কথার চাকচিক্যে সে এক ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন মেয়েকে অভিভূত করে ফেলতে পারে। দাঁতের ডাক্তার না হয়ে বিমল যদি অভিনেতা হত তাহলে আরও অনেক বেশী নাম করতে পারত। বিমলের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসবার পরও কাকাবাবু অনীতাকে কোন গঞ্জনা দেন নি। সেইজন্য কাকাবাবুর সঙ্গেই শুধু অনীতা মন খুলে কথা বলতে পারে।

অনীতা কাকাবাবুর ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকামণি, তুমি চা খেয়েছ ? চা দিয়েছে তোমাকে ?

কাকাবাবু একটা মোটা বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁ, দিয়েছে। আয় বোস।

কাকাবাবুর ঘর জোড়া একটা পুরোনো আমলের পালঙ্ক। জানালার ধারে একটা ছোট্ট শ্বেত পাথরের টেবিল আর একটা চেয়ার। আর এক আলমারি বই, অন্য আলমারিতে জামাকাপড়। অনীতা পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু আধশোওয়া হয়ে ছিলেন। পালঙ্কের ভিতরে একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে বললেন, এখানে বোস। তোর হাতে ওটা কি ?

অনীতা বলল, একটা সিনেমার পত্রিকা।

কাকাবাবু বললেন, দেখি, দে তো একটু দেখি !

কোল থেকে গীতাভাষ্যখানি সরিয়ে রেখে তিনি আগ্রহের সঙ্গে সিনেমা পত্রিকাটি নিলেন অনীতার হাত থেকে। পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখতে লাগলেন। গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে তিনি একটিও ফিল্ম দেখেন নি। কিন্তু সব পত্র-পত্রিকা দেখতে তিনি খুব ভালবাসেন। একটা ছবির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, এই তো নার্গিস, না রে ?

অনীতা হেসে বলল, নার্গিস তো কবে বুড়ি হয়ে গেছে। ও হচ্ছে হেমা মালিনী।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাই তো। এ মেয়েটিকেও দেখতে খুব সুন্দর। হ্যাঁ রে, ওর বিয়ে হয়ে গেছে ?

একই পত্রিকা থেকে ছবি দেখার জন্য দুজনে খুব কাছাকাছি সরে এসেছে। এক সময় কাকাবাবু তাঁর মাথাটা অনীতার বুকের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন, আমাদের বুড়ি কিন্তু এই মেয়েটার চেয়ে কম সুন্দর নয় !

বুড়ি অর্থাৎ অনীতা। অনীতা হেসে বলল, কম কেন, আমি ওর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। তাই না ?

কাকাবাবু অনীতার গালে আর ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে বললেন, সুন্দরই তো। তোর মতন সুন্দর তো আমি আর একটাও দেখি না রে, বুড়ি!

কাকাবাবু একবার আড় চোখে তাকালেন দরজার দিকে। ঘরে ঢোকার সময় দরজা চেপে বন্ধ করে দিয়েছে অনীতা। যেমন সে রোজই দেয়। এই সময় অন্য কেউ হঠাৎ ঘরে ঢোকে না।

অনীতা কাকাবাবুর চুলে একটা হাত ডুবিয়ে দিল। কাকাবাবু একটা হাত অনীতার যৌবনময় উরুতে বোলাতে লাগলেন খুব আস্তে আস্তে। আর একটা হাত বেষ্টন করল অনীতার কোমর। ঠিক শিশুর মতন তিনি তাঁর মুখখানা চেপে রাখলেন অনীতার এক স্তনের ওপর। এক কালের জেলখাটা দেশসেবক যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম চাইছেন। যেন বহুকালের অবরুদ্ধ কাতরতাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, আঃ!

ব্যাস, এই পর্যন্ত। কাকাবাবু এর বেশী আর এগোন নি কোনদিন। অসীম সংযম তাঁর। এই জন্যই কাকাবাবুকে এত ভাল লাগে অনীতার।

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, তুই বিমলের কথা ভেবে দুঃখ করিস না। আমি যতদিন আছি, তোর কোন কষ্ট হবে না। আজকাল তো মেয়েদের দু'বার বিয়ে হয়। আমি একটা ছেলে দেখে তোর আবার বিয়ে দেব!

বিমলের জন্য দুঃখ করতে বয়েই গেছে অনীতার। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, বিমলকে সে কোনদিনই ভালবাসে নি। সে কাকাবাবুকেই ভালবাসে।

॥ চার ॥

দু'দিন ধরে রণুর আবার জ্বর ছেড়েছে। সে ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে এসেছে। যখন হাওয়া থাকে সামনের দিকে, তখন এ ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়াবার বেশ অসুবিধে হয়। একটু পরেই সানুদাদের বাড়ির ছাদ, সেখানে মস্ত বড় এরিয়াল। একটু এদিক ওদিক হলেই ঐ এরিয়ালে ঘুড়ি আটকে যায়। পুরোনো আমলের রেডিওর জন্য ছাদে ও রকম এরিয়াল টাঙাবার দরকার হত। আজকালকার ট্রানজিস্টার রেডিও তে ও সব লাগে না। তবু সানুদাদের বাড়িতে এরিয়াল রয়ে গেছে। বোধহয় ওটা খুলে ফেলার কথাই কেউ ভাবে না।

খানিকটা দূরে রায়বাড়ির ছাদ থেকে তিন চারজন ছেলে একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায়। ও বাড়ির ঘুড়িগুলো ঠিক বাঘের মতন। অন্য ঘুড়ি দেখলেই এক লাফে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কুচ করে কেটে দিয়ে যায়। ওদের নিজস্ব মাঞ্জা। রণু ওদের ঘুড়ি দেখলেই পালাবার চেষ্টা করে।

সেদিন রণু দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ পর্যন্ত কোনদিন সে যা পারে নি, সে রকম একটা জিনিস পেরে গেছে। একটা ঘুড়ি লটকেছে। একটা লাল রঙের ঘুড়ি কেটে আসছিল অনেক দূর থেকে, রণুর পেটকাটাটা তার কাছে যেতেই দুটোর সুতোয় জড়িয়ে গেল। এখন খুব সাবধানে টেনে নামাতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে দুটোই একসঙ্গে ছিঁড়ে উড়ে যাবে। উত্তেজনায় রণুর বুক ধক ধক করছে। সে আস্তে আস্তে টেনে ঘুড়ি দুটোকে নামাচ্ছে। এই সময় তেড়ে এলো রায়বাড়ির একটা কালো চাঁদিয়াল। আকাশে অনেক

উচুতে, যেখানে শকুনরা ওড়ে, সেইখানে বুঝি লুকিয়ে ছিল কালো চাঁদিয়ালটা, এবার হঠাৎ সাঁ করে নেমে এলো। একসঙ্গে রণুর ঘুড়ি আর লটকানো ঘুড়ি দুটোই কেটে দেবে। রায়বাড়ির ঘুড়ির কাছে নিস্তার নেই। তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে পালাবার জন্য রণু নিজের ঘুড়িকে গোঁৎ খাওয়াল, অমনি দুটোই আটকে গেল সান্নুদাদের বাড়ির এরিয়ালে।

রণুর কান্না পেয়ে গেল। এরিয়ালে এমন ভাবে দুটো ঘুড়ি জট পাকিয়েছে যে খোলবার আর উপায় নেই। সান্নুদাদের বাড়ির ছাদে কেউ থাকে না। একমাত্র উপায়, রণু যদি ও বাড়িতে চলে গিয়ে ঘুড়ি দুটো খুলে নিয়ে আসে। ওদের চিলেকোঠার ওপরে উঠলে এরিয়ালটায় হাত পাওয়া যায়। রণু জানে, এরিয়াল ছুঁলে কারেন্ট মারে না। কিন্তু মা ও বাড়িতে যেতে বারণ করেছেন। মাকে না জানিয়ে যদি যাওয়া যায়? ও বাড়িতে ঢোকার অবশ্য কোন অসুবিধে নেই। বাড়ির দরজা সব সময় হাট করে খোলা থাকে—সিঁড়ি দিয়ে যে যখন খুশি ওপরে ওঠে। একদিন চারতলার ওপরে একটা ছিঁচকে চোর ধরা পড়েছিল বিকেলবেলা। সে এমনিই ছাদের ওপর উঠে লুকিয়ে বসে ছিল। রণুকে ওরা চেনে, কেউ চোর ভাববে না।

লাটাইটা নামিয়ে রেখে রণু নীচে নেমে গেল। মা বাথরুমে গা ধুচ্ছেন। এই সুযোগ। পা টিপে টিপে রণু বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সান্নুদাদের বাড়ির সিঁড়িটা অন্ধকার। দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কেউ সারায় না। দোতলায় মান্তুরা থাকে। রণু মান্তুকে ডাকল না। তিনতলায় দারুণ ঝগড়া চলছে সান্নুদার দুই দাদার মধ্যে। সান্নুদার ঘরে তালা বন্ধ। দুটো তালা ঝুলছে। দুই দাদা ঐ দুটো তালা ঝুলিয়েছে। কয়েক দিন ধরে সান্নুদার পাত্তা নেই। তাই অন্য কোন ভাই যাতে আগে থেকে ঘরটা দখল করে না নিতে পারে, তাই দুজনেই আলাদা আলাদা তালা লাগিয়েছে। এই নিয়ে আবার ঝগড়া।

সান্নুদা কয়েক দিন না ফিরলেই ওরা ধরে নেয় যে সান্নুদা মরে গেছে। যারা সব সময় বাড়ির বাইরে থাকে, রাতে বাড়ি ফেরে না, তারা বেঘোরেই মরে। সান্নুদা বাঁচুক বা মরুক তাতে অন্য ভাইদের কিছু যায় আসে না, সবাই চায় সান্নুদার ঘরটা! এর মধ্যে আবার সান্নুদার বড়দা এসে গম্ভীর ভাবে বললেন, যে-ই তালা লাগাক, সান্নু যদি আর না ফেরে, তাহলে ঐ ঘর হবে আমার। ব্যাস, ঝগড়া আরও জমে উঠল। এর ফাঁক দিয়ে রণু উঠে গেল ছাদে।

চিলেকোঠার ওপরে উঠবার কোন উপায় নেই। অন্য সময় রণু সান্নুদাদের ছাদে একটা বাঁশের মই দেখেছে, এখন সেটা নেই। কিন্তু এরিয়ালে এখনো ঘুড়ি দুটো টাটকা অবস্থায় ঝুলছে, সে দুটো না নিয়ে রণুকে চলে যেতে হবে? অসম্ভব!

জানালার শিক ধরে কোন রকমে রণু ওপরে উঠে গেল। ন্যাড়া ছাদ, তার ভয় করছে। এখন রাস্তা থেকেও দেখা যাচ্ছে তাকে। যদি দাদা বা বাবা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই সর্বনাশ। সবেমাত্র আজই ভাত খেয়েছে রণু। তার শরীর দুর্বল, এত উঁচুতে উঠে তার মাথা ঘুরছে। খুব সাবধানে রণু এরিয়ালটা ধরে নীচু করল। পটাং পটাং করে ছিঁড়ে নিল ঘুড়ি দুটো। নামবার সময় তাকে লাফিয়ে নামতে হল। ঘুড়ি দুটো ছেঁড়ে নি। কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালিতে খুব লেগেছে। তবু ঘুড়ি দুটো পাওয়ার আনন্দ এতই বেশী যে ব্যথাটা সে গ্রাহ্যই করল না।

নেমে আসার সময় দেখল যে ঝগড়াটা এখন খুব ঘোরালো হয়ে এসেছে। এর পরই মারামারি শুরু হয়ে যাবে। রণু পাশ কাটিয়ে সুড়ুৎ করে নীচে আসতে গেল, কিন্তু তাকে দেখে ফেলল রঞ্জু।

রঞ্জু চেঁচিয়ে উঠল, এই, আমাদের ছাদ থেকে ঘুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিস যে?

রণু বলল, আমার ঘুড়ি, এ দুটোই আমার।

—কার হুকুমে ছাদে উঠেছিলি?

রণু পালাতে গিয়েও পারল না। রঞ্জু বাঘের মতন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। হাত থেকে ঘুড়ি দুটো কেড়ে নিয়ে মাথায় এক চাঁটি মেরে বলল, যা ভাগ!

রণু বলল, ওর মধ্যে একটা ঘুড়ি আমার। সত্যি আমার। বিশ্বাস কর।

—যা ভাগ এখনো, নইলে আরও মার খাবি!

রণুর চোখে জল এসে গেল। তার সাধের ঘুড়ি এতদূর এসেও ফস্কে গেল। সে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঙালীর মতন।

কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। ঝগড়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। এমন সব কুৎসিত গালাগাল দিতে লাগল তারা যে লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল রণুর। সে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে।

এবার দেখা হল মান্তুর সঙ্গে। সে বলল, কী রে রণু, তুই কোথায় গিয়েছিলি? আয়, আমাদের ঘরে আয়।

রণু বলল, না। আমার সময় নেই!

মান্তু বলল, তুই আজকাল আর আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন রে?

রণু কোন উত্তর দিল না।

রাগে তার গা জ্বলছে। এ বাড়ির সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। একমাত্র সানুদা ছাড়া। তার যদি গায়ে খুব জোর থাকত তাহলে সে রঞ্জুর হাত ভেঙে দিত। রঞ্জু ঘুড়ি নিয়ে কী করবে? সে তো একমাত্র বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ছাড়া অন্য কোন দিন ঘুড়ি ওড়ায় না। সব সময় তো গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সময় কোথায় ঘুড়ি ওড়াবার?

আবার রণু নিজের ছাদে উঠে এলো। চোখ ফেটে কান্না আসছে। ঘুড়ি ওড়াবার ব্যাপারে এত দুঃখ সে আর কখনো পায় নি। জীবনে প্রথম একটা ঘুড়ি লটকে সেটাকেও হাতে পেল না! সানুদা থাকলে নিশ্চয়ই রণুকে ঘুড়ি দুটো দিয়ে দিতেন। সানুদা বড্ড ভাল।

সান্নুদার গায়ের জোর রঞ্জুর চেয়ে অনেক বেশী। আহিরীটোলার হেবো গুণ্ডা এ পাড়ায় একদিন রুস্তমী করতে এসেছিল, সান্নুদা বিকেলবেলা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে সেই হোবা গুণ্ডাকে এমন তিন রদ্দা মারলেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল!

সে একটা দৃশ্য বটে। হেবো গুণ্ডার চেহারা ঠিক গুণ্ডার মতন। কালো কুচকুচে গায়ের রং, তার মধ্যে পান খাওয়া ঠোঁট টকটকে লাল। একটা হলদে রঙের চাপা প্যান্টের সঙ্গে চেন দেওয়া নীল লাল ডোরাকাটা গেঞ্জি। গলায় একটা রুমাল বাঁধা। পানের দোকান থেকে একটা সোডার বোতল নিয়ে ছুড়ে রাস্তায় ভাঙতেই সবাই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু সান্নুদা খালি হাতে গটগট করে এগিয়ে গিয়ে হেবোর কলার চেপে ধরে বলেছিলেন, এ পাড়ায় মাস্তানী? যা ভাগ!

মার খাওয়া কুকুরের মতন পালাতে পালাতে হেবো গুণ্ডা চেঁচিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, এর বদলা নেব আমি। তোকে আমি দেখে নেব ছানু।

হা হা করে হেসে সান্নুদা বলেছিলেন, আরে যা যা, তোর মতন অনেক মাস্তান আমার দেখা আছে।

সান্নুদার সবই ভাল, কিন্তু কেন যে এত বেশী মদ খান! প্রায়ই রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন না। কোথায় থাকেন রাত্তিরবেলা? সান্নুদা রাত্রে কোথায় যান, সে সম্পর্কে রণুর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু সে কথা ভাবলেই তার শরীর শিরশির করে!

সেদিন রাত্তিরে রণুর কাছে এতগুলো টাকা রেখে যাবার পর কয়েকদিন আর সান্নুদা খোঁজই নেন নি। রণু ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। যদি টাকাগুলো কোন ভাবে হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়? তারপর একদিন রাত্তিবেলা সান্নুদা এলেন টাকাটা চাইতে।

রণু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সান্নুদা বেশ কয়েকবার ফিসফিস করে ডেকেছিলেন, তবু রণু জাগে নি। তখন সান্নুদা জানালার জালের

ফুটো দিয়ে একটা ছোট্ট ইঁটের টুকরো ছুড়ে মেরেছিলেন ওর দিকে। সেটা এসে পড়েছিল রণুর ডান চোখের ওপর। রণু যন্ত্রনায় উঃ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল। ভাগ্যিস সেই চিৎকার বাবা-মা কেউ শুনতে পান নি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা আছন্ন অবস্থায় জানালার কাছে সানুদাকে দাঁড়ানো দেখে চিনতে পারে নি রণু। আবার বেশ জোরে বলে উঠেছিল, কে ?

সানুদা দারুন লজ্জিত ভাবে বলেছিলেন। আহা রে, তোর লেগেছে ভাইটি ? আহা রে, আমি বুঝতে পারি নি, ইস, আমার বড্ড দরকার, তাই এসেছি……

রণু তখন চিনতে পেরেছে সানুদাকে। কিন্তু টাকার কথাটা তার মনের মধ্যে নেই। যে-টাকার জন্য সে সব সময় চিন্তিত থাকত, ঠিক আসল সময়েই সে টাকাটার কথা ভুলে গেল ! সে জানালার কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে সানুদা ?

সানুদা বললেন, আমার সেই জিনিসটা—

রণু বলল, কোন্ জিনিস ?

সানুদা একটু অবাক হলেন। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল সামান্য। খুব আস্তে আস্তে বললেন, সেই যেটা তোর কাছে সেদিন রাখতে দিয়েছিলাম ?

রণুর সঙ্গে সঙ্গে খামটার কথা মনে পড়ল। সে বলল, ওঃ ! সেটা ! এই তো !

রণু খামটা জানালা গলিয়ে দিতেই সানুদা একবারও খুলে দেখলেন না, পকেটে ভরে নিলেন। তখন রণুর মনে হল, টাকাটা নিশ্চয়ই গোণা ছিল না সানুদার। তাহলে ওর থেকে দশটা টাকা সরিয়ে নিলে সানুদা ধরতেও পারতেন না। কেন রণু নেয় নি ! আর তখন আফশোস করে লাভ নেই।

সানুদা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে এই ভাবে খামটা আবার পকেট থেকে বার করেছিলেন। এইবার বোধহয় গুণবেন। কিন্তু

তা করলেন না। দুটো দশটাকার নোট বার করে বললেন, এই নে ভাইটি!

তখন কিন্তু রণু লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না। না।

—কেন রে। আমি দিচ্ছি, নিবি না?

—না সানুদা। আমি……আমি টাকা নিয়ে কী করব?

—তোর যা খুশি কিনবি।

—অন্য কারুর কাছ থেকে টাকা নিলে আমার মা বাবা রাগ করবেন।

—আরে আমি কি তোর পর? তুই তো আমার ছোট ভাইয়ের মতন।

—না, সানুদা থাক্……

সানুদা থমকে গেলেন। জোর করলেন না আর। রণুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুই কত ভাল ছেলে রে? হীরের টুকরো ছেলে। আচ্ছা, তোকে টাকা দেব না, তোকে একটা কিছু জিনিস কিনে দেব, নিবি তো—তখন কিন্তু না বলতে পারবি না! এখন চলি রে, একটা জরুরি কাজ আছে—

সেই যে সানুদা চলে গিয়েছিলেন তারপর থেকে তাঁকে আর রণু দেখে নি। সানুদা একটা জিনিস কিনে দেবে বলেছেন। কী জিনিস? ভেতরে ভেতরে রণু উত্তেজনা বোধ করে। উপহার পেতে কার না ভাল লাগে?

অন্ধকার হয়ে এসেছে, নীচের তলা থেকে মা ডাকছেন। এবার গিয়ে পড়তে বসতে হবে। রণু লাটাইতে সুতো গুটিয়ে নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে দেখল, শান্তিময় কাকাদের দরজাটা খোলা। সেখানে যে নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি শুয়ে শুয়ে একটা মোটা খাতায় কী সব যেন লিখছেন। রণু যতবার ওপরে এসেছে সে ঐ লোকটিকে সব সময় লিখতেই দেখেছে। কী লেখেন উনি

এত? ভদ্রলোক এ বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশী কথা বলেন না। এখানে একলা একলা থাকেন। একলা থাকতে কারুর ভাল লাগে?

ভদ্রলোক কোন দেশের গুপ্তচর নন তো! হয়তো এখানে লুকিয়ে থেকে গোপনে গোপনে সব রিপোর্ট লিখছেন। কিন্তু শান্তিময় কাকা কোন গুপ্তচরকে তাঁর ফ্ল্যাটে জায়গা দেবেন কেন? এমনও হতে পারে, শান্তিময় কাকা নিজেও ওর আসল পরিচয় জানেন না! রণুর দৃঢ় বিশ্বাস হল, ঐ নতুন লোকটি গুপ্তচরই। ওর চাউনিটাও যেন কেমন কেমন। চোখে চোখ পড়লেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এ বাড়িতে একজন গুপ্তচর লুকিয়ে আছে, এ কথাটা ভেবেই রোমাঞ্চ হয় রণুর।

রণু ঠিক করল, এই লোকটার আসল রহস্য সে একদিন ঠিক ধরে ফেলবে। গুপ্তচরের ওপর গুপ্তচরগিরি করবার জন্য সে ঘুরে গিয়ে চুপি চুপি দাঁড়াল জানালার পাশে। ঘরের ভেতরের সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল একবার। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো কাগজের টুকরো দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতগুলো কাগজ ছড়ানোর মানে কী?

লোকটির গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে! রণু সরে এলো জানালার কাছ থেকে।

দোতলায় দেখা হল অনীতাদির সঙ্গে। সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোচ্ছেন। দোতলার কেউ আর এখন রণুদের সঙ্গে কথা বলে না। একমাত্র অনীতাদি ছাড়া। অনীতাদি কী দারুণ সুন্দর। ঠিক সরস্বতী প্রতিমার মতন।

অনীতাদি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জ্বর কমে গেছে, রণু?

রণু ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—তুমি এত ভোগো কেন? প্রায়ই জ্বর হয়!

রণু লাজুক ভাবে চুপ করে রইল।

অনীতাদি রণুর পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, গত শনিবার আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। স্মৃতপার কাছ থেকে বই আনতে। তুমি তখন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিলে। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম, তুমি টেরও পেলে না।

রণু চমকে উঠল। সে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল, অনীতাদি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে সেটা কি স্বপ্ন নয়, সত্যি! আঃ, রণু কেন চোখ মেলে দেখে নি!

—আজও তো তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে, রণু। আবার জ্বর আসে নি তো?

—না না।

—দেখি। অনীতাদি রণুর কপালে হাতটা রাখলেন।

কী চমৎকার ঠাণ্ডা স্পর্শ। অনীতাদির গা থেকে দারুন সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। রণু আরামে চোখ বুজল। তার ইচ্ছে হল, সে এক্ষুনি একটা এক বছরের শিশু হয়ে যায়, আর অনীতাদির বুকে মুখ লুকোয়। কেন তার এমন ইচ্ছে হল, তা সে নিজে জানে না। এ পৃথিবীতে রণু তার মায়ের পরেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে অনীতাদিকে।

অনীতাদি আবার বললেন, রণু, তুমি বুঝি অনেক রাত জেগে পড়াশুনো কর?

রণু বলল, না তো।

—আমি যে প্রায়ই দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলে। রাত্তির একটা দুটো—

রণু একটু লাজুক ভাবে হাসল, তারপর বলল, আপনিও বুঝি অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন? নইলে দেখলেন কী করে?

—হ্যাঁ, আমার ঘুম আসে না। আমি জেগেই থাকি। কিন্তু আমি তো তোমার মতন অত পড়াশুনো করি না! কিন্তু তুমি এখন

অত রাত অবধি জেগো না রণু, লক্ষ্মীটি, এখন তো তোমার শরীর ভাল নয়।

অনীতাদি আবার রণুর কাঁধে হাত রাখলেন সস্নেহে।

রণুর সারা শরীর কেঁপে উঠল।

একতলায় পৌঁছে রণু চলে গেল নিজের ঘরে আর অনীতাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাথরুমে হাত মুখ ধুতে এসেও রণু অনেকক্ষণ অনীতাদির কথা ভাবল। অনীতাদি বড্ড ভাল, অথচ এই অনীতাদিকেও রতনদা শিবুদা পর্যন্ত মাঝে মাঝে বকাবকি করে।

রণুর যদি এক বছর বয়েস হত, তাহলে অনীতাদি নিশ্চয়ই তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতেন। রণুর এখন চোদ্দ বছর বয়েস। এখন যদি রণু হঠাৎ বলে ফেলে, অনীতাদি, আমাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন? তা হলে কি খুব রাগ করবেন অনীতাদি? কথাটা ভেবেই লজ্জায় রণুর শরীরটা গরম হয়ে গেল।

রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে রণু ভাবছিল সানুদার কথা। সানুদার দাদারা কি অদ্ভুত। সানুদা ক'দিন ধরে বাড়ি ফেরে না, সে জন্য তার দাদারা কোথাও খোঁজ খবর নিচ্ছে না—শুধু এরই মধ্যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে যে সানুদা না ফিরলে তার ঘরটা কে নেবে! মানুষ এ রকম হয় কী করে? ওরা সবাই এক মায়ের পেটের ভাই। সানুদার বাবা বেঁচে থাকতে ও বাড়িতে কেউ কোনদিন টুঁ শব্দটিও করে নি। সানুদার মা মরে গেছেন অনেক আগে।

সানুদার বাবাকে রণু খুব ছোটবেলায় দেখেছে। ভাল করে মনে নেই। উনি ছিলেন একজন বেশ নাম করা উকিল। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন খুব। যেমন রোজগার করতেন প্রচুর টাকা, তেমনি খরচও করতেন। পাড়ার দুর্গাপূজোর সময় সবচেয়ে

বেশী চাঁদা দিতেন তিনি। আর সব ভলান্টিয়ারকে নাকি একটা করে নতুন জামা উপহার দিতেন।

সেই সানুদার বাবা একদিন ভাত খাওয়ার পর জলের গেলাসে চুমুক দিয়েই হঠাৎ হেঁচকি তুলে মরে গেলেন। অমনি সমস্ত সংসারটা ছত্রাখান হয়ে গেল। সানুদা তখনও স্কুলের ছাত্র। দাদারা সবাই টপাটপ বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতে ফেলল। সানুদার দিকে কেউ নজর দিল না। সানুদা বখে গেল আস্তে আস্তে, পড়াশুনোই করল না আর।

এ পৃথিবীতে সানুদাকে আর কেউ ভালবাসে না। অথচ সানুদারও চেহারা কত সুন্দর, ব্যবহারও কত ভাল। কেউ ভালবাসলেই সানুদা নিশ্চয় অন্য রকম মানুষ হয়ে যেত!

ঠিক সেই সময় আচম্বিতে সানুদা আবির্ভাব হল বাড়ির সামনে। সানুদা একদম বদ্ধ মাতাল অবস্থায় এসেছে। দমাদ্দম করে লাথি মারছে নিজেদের বাড়ির দরজায়। ও বাড়ির দরজা আজ ভেতর থেকে তালাবন্ধ।

জড়িত গলার সানুদা বাড়ির চাকরের নাম ধরে চ্যাচাচ্ছে, কেষ্টা, এই শূয়োরের বাচ্চা কেষ্টা, দরজা খোল!

দু'দিন ধরে অল্প অল্প শীত পড়েছে। পাড়াটা এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে পড়েছে। সবাই ঘুমোতে গেছে তাড়াতাড়ি। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সানুদার চিৎকারে সারা পাড়া গমগম করে ওঠে। এ পাড়ায় শুধু এই একটিই বাড়িতে রাত দুপুরে চ্যাচামেচি হয়।

একটু পরে ওপর থেকে সানুদার বড়দা বললেন, না, দরজা খোলা হবে না। যেখান থেকে এসেছিস সেখানে যা। মাঝরাত্তিরে এসে বেলেল্লাপনা! এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি!

সানুদা বলল, এঃ! ভদ্দরলোক! কে কত ভদ্দরলোক আমার জানা আছে! দরজা খুলবে না মানে, আলবৎ খুলবে! কেষ্টো···এই হারামজাদা কেষ্টো···

—না, কেষ্টো খুলবে না, দরজায় তালা—

—কার হুকুমে তালা দিয়েছে, অ্যাঁ ?

—আমার হুকুমে।

—তুমি হুকুম দেবার কে ? এটা তোমার একলা বাপের বাড়ি ? এটা আমারও বাপের বাড়ি।

—দূর হয়ে যা হতভাগা। এত রাত্রে এখানে মাতলামি করতে এসেছিস !

—বেশ করেছি। কারুর বাপের টাকায় খাই নি। নিজের টাকায় মাল খেয়েছি। কেষ্টো—

—দরজা খোলা হবে না, যেখানে অ্যাদ্দিন ছিলি সেখানেই যা, হারামজাদা !

—কে আমায় হারামজাদা বললে ? কে ? তোমরা হারামজাদা নও ? আমি একলা ? শিগগির দরজা খোল বলছি !

—না ! এ বাড়িতে তোর আর জায়গা হবে না।

—এঃ ! জায়গা হবে না ! আমার ভাগের ঘর তোমরা দখল করে নেবে ? মামদোবাজি !

আবার দরজায় দড়াম দড়াম লাথি।

এবার ওপর থেকে রঞ্জু বলল, সানুকাকা, এত রাতে ঝামেলা কর না। কেটে পড়।

—তুই আবার কে রে ? কোন্ হারামীর বাচ্চা আমাকে কেটে পড়তে বলছে ? আমার নিজের বাড়ি—

—মুখ খারাপ করো না বলছি সানুকাকা। তাহলে একদম মুখ ভেঙে দেব।

—কোন্ বাপের ব্যাটা আমার মুখ ভাঙবে। দেখি, আয়। দরজা খোল্।

—না, দরজা খোলা হবে না।

—দরজা ভেঙে ফেলব শালা !

দড়াম দড়াম করে দরজায় এবার খুব জোরে লাথি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকেও ছচ্ছড় করে কিছু পড়ার আওয়াজ হল, বোধহয় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে রঞ্জু।

সান্নুদা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!

রঞ্জু বলল, আর টেঁটিয়াবাজি করবে?

সান্নুদা খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কাতর শব্দ করল, উঃ উঃ! তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে রঞ্জুর উদ্দেশ্যে বলল, দাঁড়া, তোকে একবার হাতের কাছে পাই! তোর বাপের নাম যদি ভুলিয়ে না দিই আমি—

আবার ওপর থেকে ছচ্ছড় করে গরম জল পড়ার আওয়াজ।

পাড়ার অন্য কোন বাড়ির জানালা খুলে হঠাৎ কেউ বলল, এত রাতে এটা কি হচ্ছে! আমরা কি ঘুমোতে পারব না? পুলিশে খবর দেব?

সান্নুদা বলল, দাও না, দেখি কত বড় মুরোদ। আসুক, দেখি কোন্ পুলিশের বাচ্চা আমাকে কি করে। আমি নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারব না?

আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চলল। কিন্তু দরজা খোলা হল না সান্নুদাকে। তারপর সান্নুদা বলল, ঠিক আছে, আমি কাল সকালে আসব। দেখে নেব সব শালাদের! এ কি বাবা মগের মুল্লুক! আমাকে আমার বাড়ি ঢুকতে দেবে না! নিজের বাড়িতে আমি যখন খুশি, যেদিন খুশি আসব, কার বাবার কি? অ্যাঁ? কার বাবার কি? দেখাব এসে কাল সকালে। এখন যাচ্ছি। আমার কি শোবার জায়গার অভাব? কত বাড়ির দরজা খোলা আছে আমার জন্য! আদর করে ডেকে নেবে!

রণু ঘর অন্ধকার করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। তার কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। এত সব খারাপ খারাপ কথা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সান্নুদা তার নিজের দাদাদের এমন বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে পারে? আজ পাড়ার সকলেই সান্নুদাকেই দোষ দেবে। সান্নুদাই

চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেছে। সানুদা দিন দিন এখন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? তবু, রণুর মনে হল, সানুদাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিল। এত রাতে সানুদা অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় থাকবে?

রাস্তায় সানুদার পায়ের চটি ঘষটানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। সানুদা চলে যাচ্ছে।

মিনিট দশেক বাদেই রণুর ঘরের জানালায় এসে ফিসফিস করে ডাকল সানুদা—রণু! ভাইটি ঘুমিয়েছিস?

রণু ধড়মড় করে উঠে পড়ে আলো জ্বালল। সানুদার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ভাল করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। দেয়াল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যেন হাঁপাচ্ছে। রণুর ভয় হল, এক্ষুনি বুঝি সানুদা রাস্তায় পড়ে যাবে! একবার তার ইচ্ছে হল সদর দরজা খুলে সানুদাকে ভেতরে নিয়ে আসে। কিন্তু বাবা-মা আর রক্ষে রাখবেন না।

সানুদা বলল, তুই উঠে পড়লি আমার ডাক শুনে? কেন, মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতে তো পারতিস! এমন ভান করতিস, যেন শুনতেই পাচ্ছিস না কিছু। তা না করে তুই উঠে পড়লি কেন ভাইটি? আমি তোর কে? আমি তো একটা বাজে লোক?

রণু তার কিশোর বয়েসের অবাক ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সানুদার দিকে। কোন কথা বলল না।

—তুই কেমন আছিস ভাইটি? তোর আর জ্বর হয় নি তো?

—না, সানুদা।

—তুই ছাড়া আমাকে আর কেউ ভালবাসে না রণু! কেউ না। তুই কেন এত ভাল রে? আমি তো বাজে! যা-তা। এক গেলাস জল দিতে পারিস?

রণুর খালি ভয় হচ্ছে, পাশের ঘর থেকে তার দাদা না কিছু শুনতে পায়। তা হলেই দাদা রাগারাগি করবে। এত রাত্রে একজন

মাতালের সঙ্গে রণুর কথা বলা কেউ পছন্দ করবে না। কিন্তু কেউ জল চাইলে কি না বলা যায়?

রণুর ঘরে ছোট কুঁজোয় জল থাকে। সে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনল। জানালার তারে জালের ফুটোটা এখন এত বড় হয়ে গেছে যে গেলাসটা একটু কাত করে অনায়াসে গলিয়ে দেওয়া যায়। রণু গেলাসটা বাড়িয়ে দিল।

সান্নুদা জলটা নিয়ে চোখে মুখে ছেটাল ভাল করে। তারপর বলল, আর এক গেলাস।

দ্বিতীয় গেলাস জল নিয়ে সান্নুদা এমন ভাবে খেল যেন বহুকালের একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ। তারপর গেলাসটা ফেরত দিয়ে সান্নুদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলতে লাগল, আমায় কেউ ভালবাসে না রে রণু! শুধু তুই! তুই কেন এত ভাল রে? বাঙালরা বড্ড ভাল হয়। আমি কত খারাপ···আমি তোর জন্য একটা জিনিস আনব বলেছিলাম···আমি নিমকহারাম, সে কথা ভুলে গেছি···রণু, আমি এত খারাপ কেন হলাম রে?

কান্নার চোটে নাকে সর্দি এসে গেল। সান্নুদা রুমাল বার করে নাক আর চোখ মুছল। আঙুলগুলো চিরুনীর মত চালিয়ে দিয়ে চুলগুলো ঠিক করল একটু। এত অত্যাচার করলেও সান্নুদাকে এখনো রাজপুত্রের মত দেখায়।

সান্নুদা বলল, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। ওরা আমায় বাড়িতে ঢুকতে দিল না। এটা কি উচিত হল? তুই বল? আমার নিজের ঘর—

—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, সান্নুদা?

—জাহান্নমে। কিন্তু জানিস তো, পয়সা না থাকলে জাহান্নমেও জায়গা হয় না। আজকাল শালা দুনিয়াটা এই রকম। কিন্তু আজ আমি আবার টাকা পেয়েছি। আজ ভেবেছিলাম নিজের বাড়িতে শুয়ে ঘুমোব···

রণু ভয় পাচ্ছে। কথার নেশায় পেয়ে বসেছে সানুদাকে। দাদা কিংবা বাবা জেগে উঠতে পারেন আওয়াজ শুনে। অথচ সে কী করে সানুদাকে চুপ করাবে?

—রণু, ওরা আমার মাথায় গরম জল ঢেলে দিয়েছে। আমার মাথায় ফোস্কা পড়ে গেছে। তোর কাছে ডেটল আছে?

—আমার কাছে তো নেই। ও হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান—

রণুর মনে পড়ে গেছে। দাদা দাড়ি কামায়। তারপর গালে ডেটল মাখে। বাথরুমে রয়েছে সেই শিশিটা। রণু খুব সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বেরুল। পা টিপে টিপে গিয়ে বাথরুম থেকে নিয়ে এলো ডেটলের শিশিটা। তারপর জানালা গলিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল সানুদাকে।

কিন্তু কোন লাভ হল না। সানুদা শিশিটার ছিপি খুলতে গিয়ে সব শুদ্ধ ফেলে দিল হাত থেকে। রাস্তায় পড়েই শিশিটা ভেঙে গেল। সানুদা আবার কেঁদে ফেলে বলল, দেখলি তো, আমার ভাগ্যে নেই। তুই আর কী করবি!

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সানুদা বলল, চলি। তোর কাছে কেন যেন এলাম? ও হ্যাঁ, আমার একটু উপকার করবি ভাইটি, আমার দুটো একটা জিনিস রাখবি তোর কাছে? দুনিয়ায় তোকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না আমি। রাখবি?

—কী রাখব সানুদা?

—আজ শনিবার রেস ছিল তো? সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জিতেছি আজ। জ্যাকপট মেরেছি, বুঝলি? এর মধ্যেই সাতশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম বাড়িতে গিয়ে এখন ঘুমোব। দরজাই খুলল না। দেখি কাল সকালে এসে, কেমন দরজা বন্ধ করে রাখে। আমিও পুলিশ নিয়ে আসব। আমিও বাপের ব্যাটা। এখন যদি সব টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে যাই, তাহলে সব উড়ে যাবে। ওরা নিয়ে নেবে, ছাড়বে না।

—কারা নিয়ে নেবে?

—সে তুই বুঝবি না। তোর বুঝেও দরকার নেই। তুই ভাল হয়ে থাক। আজ যদি এই টাকাগুলো আমি না জিততাম তাহলে একদম খতম হয়ে যেতাম। আর একটাও টাকা ছিল না। তুই রাখবি এগুলো ভাইটি? আমি কাল এসে নেবো। ঠিক কাল সকালবেলা আসব। রাখতে পারবি, ভাইটি? আমার জন্য এইটুকুনি করবি?

রণু ঘাড় হেলাল।

আজ আর থাম নেই। তাড়া তাড়া নোট সান্নুদা গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে। দোমড়ানো মোচড়ানো সব একশো টাকার নোট। টাকাগুলো দেবার পর চলে যাবার চেষ্টা করে সান্নুদা শরীরটাকে কয়েকবার দোলাল, তারপর কী যেন মনে পড়ল আবার।

সান্নুদার গায়ে একটা পুরনো আমলের দামী শাল। সেটা গা থেকে খুলে বলল, এটাকেও রাখ। এটা নিয়ে গেলে আজ আমি নির্ঘাৎ হারাব। হাঁটতে পারছি না, দেখছিস না? রণু, তুই যেন কোনদিন মাল খাসনি। বড় পাজী জিনিস। চলি, অ্যাঁ? বড্ড উপকার করলি রে ভাইটি। আমার এখন বড্ড টাকার দরকার, যদি এ টাকাগুলো হারাতাম, তাহলে সব কেলো হয়ে যেত। তুই আমার যা উপকার করলি—

তারপর দেওয়াল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সান্নুদা একটা বড় নিশ্বাস নিল। গলার স্বর বদলে গেল। মাতালদের মাথায় এক এক সময় বিশেষ রকম প্রজ্ঞা এসে ভর করে। সেই রকম কিছু একটা পেয়েই যেন সান্নুদা বলল, জানিস রণু, যারা গরীব দুঃখীদের দয়া করে, ভগবান তাদের ভালবাসে। আমি ভীষণ গরীব আর ভীষণ দুঃখী, তবু তুই যে আমাকে ঘেন্না করিস না···সে জন্য তোকে···কী বলব, তোরাও গরীব, আমি জানি···কিন্তু কিছু গরীব হয় হ্যাংলা আর ভীতু, আর কিছু গরীবের, আমি জানি, জানি রে, সব জানি, কিছু গরীবের থাকে

সু—৪

আত্মসম্মান। যাদের আত্মসম্মান থাকে, তারাই হচ্ছে আসল বাপের ব্যাটা, তারা সব শালা বড়লোকদের চেয়েও ঢের বড়। তুই একদিন সে রকম···আমি জানি···ওহ্···আবার চোখে জল আসছিল, সানুদা আর দাঁড়াল না। হঠাৎ একেবারে সুস্থ লোকের মতন সোজা হয়ে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল তার জুতোর শব্দ···।

সানুর বুকটা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। সানুদাকে এত বেশী কথা বলতে সে কখনো শোনে নি। তা ছাড়া একটু আগে যে লোক অত বিশ্রী ভাষায় নিজের দাদার সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলছিল, সেই মানুষটাই এখানে এসে একেবারে অন্য রকম ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করল কী করে? মানুষ কি অমন ভাবে বদলাতে পারে? নাকি একটা মানুষের মধ্যেই দুটো মানুষ থাকে? বাবা একদিন বলেছিলেন, মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষ একদম বদলে যায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম কথাবার্তা বলে।

হঠাৎ এ কথাটা মনে হল কেন রণুর? সানুদার কি আজ রাত্রেই কিছু হবে? এত রাতে রাস্তায় কত গুণ্ডা বদমাশ থাকে···না, না! রণুর শরীরটা কেঁপে উঠল একবার।

রণুর খাটের নীচে একটা লোহার ট্রাঙ্ক আছে। তাতে রাজ্যের অকেজো জিনিস জমা থাকে। খুব সাবধানে রণু ট্রাঙ্কটা টেনে বার করল। এটা সহজে কেউ দেখে না। এর মধ্যে শালটা রেখে দিলে কারুর চোখে পড়বে না।

টাকাগুলোও এর মধ্যে রাখা যায়। সানুদা যখন গোণেন নি তখন তো আর গোণবার দরকার নেই। তবু টাকা একটু বেশীক্ষণ ধরে ছুঁয়ে দেখতেও ভাল লাগে।

রণু মাটিতে পা ছড়িয়ে টাকাগুলো গুণতে বসল। মাঝে মাঝে কিছু টাকা এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে, রণু আবার খপ করে ধরছে। একটাকেও পালাতে দেবে না।

টাকাগুলোকে মনে হয় এমনিই কাগজের টুকরো। তাছাড়া তো আর কিছুই না। তবু এই টাকার জন্যই যে পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যায় রণু তা বুঝতে শিখেছে। টাকার জন্য বাবা মায়ের মধ্যেও ঝগড়া হয়।

তিনবার গুণে রণু দেখল সবশুদ্ধ চার হাজার দুশো পঁচিশ টাকা রয়েছে। সানুদা বলেছিল, আজই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জিতেছে। এর মধ্যে এত টাকা খরচ হয়ে গেল? একদিন—তাও পুরো একদিন নয়, সন্ধ্যে থেকে রাত বারোটার মধ্যে সানুদা এক হাজার টাকারও বেশী খরচ করে ফেলল! অথচ এই টাকা সারা মাস পরিশ্রম করেও রণুর বাবা রোজগার করতে পারে না। মাত্র পনেরো টাকার জন্য রণু একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট কিনতে পারে নি। পৃথিবীটা এমন অদ্ভুত জায়গা!

সানুদা পকেট থেকে এমন ভাবে দলা মোচা করে টাকাগুলো বার করছিল যে দু-একটা রাস্তায় পড়ে যেতে পারে। যদি একশো টাকার নোট পড়ে যায়, তাহলেই তো সর্বনাশ। রণু জানালার বাইরে উঁকি মেরে দেখল। ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় যেন সাদা সাদা কিছু পড়ে আছে ভাঙা শিশিটার পাশে। এক্ষুনি একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসা উচিত। কিন্তু সদর দরজাটায় বিরাট লোহার খিল আর ওপরে ছিটকিনি। খুলতে গেলে শব্দ হবেই। দরজা খুলতে গেলে, মা ঠিক ধরা পড়ে যাবে। অথচ সত্যিই যদি রাস্তায় টাকা পড়ে থাকে...
সানুদা বলল সাতশো টাকা খরচ হয়েছে...তা হলে বাকি টাকা...
সানুদা গুণে দিয়ে গেল না, কিন্তু আগের বার যদিও গুণে ফেরৎ নেয় নি, কিন্তু এবার যদি—

সেই টাকার স্তূপের সামনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল রণু। এতগুলো টাকা দিয়ে কত কিছু করা যায়। অথচ এই টাকার কোন দামই নেই তার কাছে। টাকাগুলো সব গুছিয়ে তুলে লোহার ট্রাঙ্কে রাখার পর অকারণেই যেন খুব মন খারাপ হয়ে গেল রণুর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণু শুয়ে পড়ল।

যথারীতি পরের দিন সকালে সানুদা এলো না। তার পরের দিনও না। মঙ্গলবার দিন বিকেল বেলা স্কুল থেকে ফিরছে রণু তখন পাড়ার মোড়ে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে পেল। আহিরী-টোলার হেবো গুণ্ডার সঙ্গে দারুণ মারামারি করেছে সানুদা। কোন্ একটা মেয়ের জন্যে নাকি ঝগড়া হয়েছিল। সানুদা ওকে এমন মেরেছে যে একদিন পর হাসপাতালে মরে গেছে হেবো। সানুদা কোথায় উধাও হয়ে গেছে তারপর। পুলিশ খুঁজছে সানুদাকে, ধরতে পারলেই ফাঁসি দেবে।

॥ পাঁচ ॥

আপনি চা খাবেন ?

নীলাঞ্জন একটু চমকে উঠে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, ষোল সতেরো বছর বয়স হবে। ফ্রক পরা, কিন্তু মেয়েটির স্বাস্থ্য এমন ভাল যে এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরলেই তাকে মানায়। রমেনবাবুর ছোট মেয়ে নিশ্চয়ই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি চা খাবেন ?

নীলাঞ্জন বলল, চা ? না—মানে—আমার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে।

—আর খাবেন না ?

—হ্যাঁ, তা খেতে পারি।

—এখানে এনে দেব না আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন ? বাবা আপনাকে বলতে বললেন, আপনি যদি চা খেতে চান, তাহলে আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে। বাবা এখন চা খাচ্ছেন।

মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই নীলাঞ্জন খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তার পাজামার দড়ি আলগা। এই ফ্ল্যাটে সে একলা থাকে, কেউ তাকে দেখতে আসে না। সে একটু এলোমেলো অবস্থায় থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়েটিকে দেখেই সে তার কোমরের কাছে খবরের কাগজ চাপা দিয়েছে। এখন উঠে দাঁড়াতে গেলে তাকে পাজামার দড়ি বাঁধতে হবে। মেয়েটির সামনে তা কেমন করে হয় !

—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এই দু' মিনিটের মধ্যে—

এ কথা শোনার পরেও মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো। তারপর বলল, শান্তিময় কাকার মেয়ে শম্পা, ওকে আপনি চেনেন?

নীলাঞ্জন বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনি। একদম ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি।

মেয়েটি বলল, শম্পা আমার বন্ধু। ওরা কবে আসবে?

—ঠিক নেই, বোধহয় আরও মাস দুয়েক দেরি হবে

—আচ্ছা, শম্পা বইয়ের আলমরিতে কি তালা দিয়ে গেছে?

—বোধহয়, মানে—আমি ঠিক জানি না।

—একটু দেখব?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেয়েটি চলে গেল পাশের ঘরে। এক্ষনি নীলাঞ্জন খবরের কাগজটা সরিয়ে পাজামার দড়িটা বেঁধে ফেলল। গত রাত্রে ছেড়ে রাখা হাওয়াই শার্টটা সে ফেলে রেখেছিল টেবিলের ওপরে। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল চট করে। মেয়েদের সামনে খালি গায়ে থাকতে চায় না সে।

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। নীলাঞ্জন উদ্যোগ করছিল বাথরুমে যাবার।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ, তালা দেওয়া। শম্পা আমার দুটো গানের খাতা নিয়েছিল, ফেরৎ দিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আপনার কাছে চাবি নেই?

—আছে কয়েকটা চাবি। কিন্তু বইয়ের আলমারির চাবি কিনা জানি না।

—ঠিক আছে, পরে এসে দেখব। চলুন, চা খাবেন তো চলুন।

—তোমার নাম কি ভাই?

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলল, আমার নামও শম্পা। এমন মুশকিল জানেন তো, সামনা সামনি দুটো ফ্ল্যাটে আমরা দুজনেই শম্পা। আবার দুজনেরই প্রায় এক বয়েস। ওরা অবশ্য চৌধুরী আমরা মুখার্জি। আমার ডাক নাম টুলটুল। আর ওর ডাক নাম—

—বুবু !

—হ্যাঁ। তাই আমাদের সবাই ডাক নামেই ডাকে। আপনিও আমায় টুলটুল বলেই ডাকবেন। চলুন চলুন চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে !

রমেনবাবুদের বসবার ঘরটা নানান্ জিনিসপত্রে বোঝাই। শোফা সেটি, টুল, মোড়া, টি-ভি, রেডিও, বইয়ের আলমারি। তার মধ্যে আবার পুরোনো আমলের একটা বিরাট আরামকেদারা। তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে লম্বা করে খবরের কাগজ মেলে পড়ছেন রমেনবাবু।

নীলাঞ্জনকে দেখেই বললেন, আসুন আসুন। সকালবেলা চা খাওয়ার জন্য কি দোকানে যাওয়া পোষায়! আমি ভাবলাম সেই কথাটা। এবার থেকে রোজ আমার এখানে এসে চা খাবেন।

নীলাঞ্জন বলল, না, আমাকে দোকানে যেতে হয় না। আমি নিজেই চা তৈরি করার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

—তবুও, সকালবেলার চা একা একা খেতে ভাল লাগে ? আরে মশাই, সোজা কথা বলতে কি, নিজের হাতের তৈরি চা কক্ষনো ভাল হয় না। সকাল বেলা আরাম করে বসে থাকব, কেউ এসে হাতে গরম চায়ের কাপ তুলে দেবে—

রমেনবাবুর স্ত্রীকে দেখে নীলাঞ্জন বিস্মিত হয়ে গেল।···ভদ্রমহিলার বয়েস অন্তত বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হতে বাধ্য। কারণ আগের দিন কথায় কথায় রমেনবাবু বলেছিলেন তাঁর ছেলে শিবপুরে হস্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তাঁর বড় মেয়ে শিখার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবেই। অথচ রমেশবাবুর স্ত্রীকে দেখলে মনে হয় শিখার বয়েসী। পাশাপাশি দাঁড়ালে কেউ বিশ্বাস করবে না, ওরা মা আর মেয়ে। শিখার মায়ের নাম সুজাতা।

এমনও হতে পারে উনি শিখার মা নন। উনি হয়তো রমেনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

তিনি নীলাঞ্জনকে নমস্কার করে একটা চেয়ারে বসে প্রথমেই বললেন, আপনি একজন লেখক ?

নীলাঞ্জন লজ্জা পেয়ে গেল। মেয়েদের কাছে লেখক মানেই তো যার অনেক বই, যার দু-একখানা বই বাংলা সিনেমা হয়েছে তেমন একজন মানুষ। কিন্তু নীলাঞ্জনের একটাও বই বেরোয় নি!

সে মুখ নীচু করে বলল, না না। লেখক ঠিক নই, মাঝে মাঝে একটু আধটু—

সুজাতা বললেন, এই তো এ মাসের একটা সিনেমা পত্রিকায় আপনার একটা গল্প বেরিয়েছে। আমি তো জানতুম না। শিখাই আমাকে বললে, মা দেখ, আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যে ভদ্রলোক নতুন এসেছেন, এটা তাঁর লেখা।

নীলাঞ্জনের বুকটা ধক করে উঠল। যে সিনেমা পত্রিকার নাম উনি করলেন, সেখানে নীলাঞ্জন এক বছর আগে একটা গল্প পাঠিয়েছিল ঠিকই। ছাপা হবে কিনা সে জানত না, তাহলে সেটা শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে! সে দেখে নি তো এখনো! পত্রিকাটা দেখবার জন্য তার মন আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

রমেনবাবু বললেন, তাই নাকি, আপনি লেখেন বুঝি! বলেন নি তো কিছু!

নীলাঞ্জন মাথা নীচু করে উত্তর দিল, সে রকম কিছু বলবার মতন নয়। এই টুকটাক; একটু আধটু!

চা নিয়ে এলো শিখা। রমেনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। সিঁড়িতে যাওয়া আসার পথে এই মেয়েটিকে নীলাঞ্জন দেখেছে কয়েক-বার। কথা হয় নি, কিন্তু চেনা হয়ে গেছে। শিখা কী করে তার নাম জানল, আর কী করেই বা বুঝল যে ঐ পত্রিকার গল্পটা তারই লেখা? মেয়েদের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে!

শিখা বলল, আপনার গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

নীলাঞ্জন কৃতজ্ঞ হয়ে গেল শিখার কাছে। তার গল্পের প্রথম পাঠিকা। এখন শিখা চাইলে তার জন্য নীলাঞ্জন নিজের বুকের রক্তও বার করে দিতে পারে।

সুজাতা বললেন, আপনি বুঝি নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে এখানে একা একা থাকতে এসেছেন লেখবার জন্য ?

নীলাঞ্জন হেসে বলল, না, আমি এসেছি শান্তিময়দার ফ্ল্যাট পাহারা দিতে।

—ভালই হল, একজন লেখককে আমরা চাক্ষুষ দেখলাম। এক সময় আমার বাপের বাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে আসতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তখন তাঁকে দেখেছি। ওঁর অবশ্য অনেক বয়েস। সেই একজন লেখককে দেখেছি আর আপনাকে দেখলাম।

তারাশঙ্করের সঙ্গে যে কোন সূত্রে তার নাম জড়িয়ে দেওয়ায় নীলাঞ্জন খুব লজ্জা পেল, আবার খুশিও হল। আজ সকালবেলাটা ভারী চমৎকার।

—আপনাকে আমরা অনেক প্লট দিতে পারি। আপনি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন ? তাহলে আপনাকে আমি একদিন সব বলব। আপনি যে সুখের পাখি নামে গল্পটা লিখেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ইয়ে, মানে যাকে বলে রোমাঞ্চকর।

রমেনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জীবনের আবার কী গল্প আছে! যা তা একটা কিছু লিখলেই লোকে পড়বে নাকি ?

সুজাতা স্বামীর প্রতি ভ্রু-ভঙ্গি করে বললেন, আছে, আমার জীবনেও অনেক কিছু আছে। সব তুমি জানো নাকি ?

শিখা বলল, মা, আজকালকার লেখকরা শুনে শুনে গল্প লেখেন না। তাঁরা নিজেরা যা দেখেন, নিজেদের যা কিছু অভিজ্ঞতা—

সুজাতা বললেন, তুই দেখছি লেখকদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছিস।

রমেনবাবু সরু চোখে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিটা যেন রহস্যময়। নীলাঞ্জন ঠিক মানে বুঝতে পারল না। তার বারবার মনে পড়ে, প্রথম আলাপে রমেনবাবু বলেছিলেন,

ব্যাচেলারদের একা ফ্ল্যাটে কেউ থাকতে দেয় না। রমেনবাবু কি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সেদিন?

চা খাবার পর একটা অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল নীলাঞ্জন। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে তার মনটা দারুণ খুশি খুশি লাগল। একটা বড় কাগজে তার গল্প ছাপা হয়েছে। একটা মেয়ে প্রশংসা করেছে সেই গল্পের। পত্রিকার সম্পাদককে যদি শিখা একটা চিঠি লিখত!

আজ আর লেখায় মন বসল না নীলাঞ্জনের। সেই পত্রিকাটা দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখার মধ্যে একটা দারুণ রোমাঞ্চ আছে। পত্রিকার একটা কপি নিশ্চয়ই দিয়ে গেছে তার নিজের বাড়িতে। আর একটা কপি আজই সে দোকান থেকে কিনে নেবে।

রমেনবাবুরা চমৎকার লোক। সবাই খুব ফ্রী, কথাবার্তায় কোন রকম আড়ষ্টতা নেই। সুজাতা কি রমেনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী! কিন্তু শিখা তো ওকেই মা বলে ডাকল, ভদ্রমহিলা সত্যিই যৌবনকে চমৎকার ধরে রেখেছেন। রমেনবাবু রীতিমত বুড়ো হয়ে গেছেন এর মধ্যে।

আর একটা কথা মনে পড়ল নীলাঞ্জনের। সেদিন গভীর রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে কাকে সে কাঁদতে দেখেছিল? শিখা? কিংবা টুলটুল? অল্পবয়েসী মেয়েরাই এমন ভাবে কাঁদে। কিংবা সুজাতাই নয় তো? অথচ ওদের তিনজনকে দেখেই তো খুব হাসিখুশি মনে হয়। দোতলায় একটি মেয়ে আছে, একতলাতেও আছে একজন। তাদেরও কেউ হতে পারে। কিন্তু তারা কি মাঝরাত্রে ছাদে উঠে আসবে? তবে আসতেও পারে। কে? কে কেঁদেছিল সেদিন! জানতেই হবে, না জানলে চলবে না।

·· মাঝরাত্রে নীলাঞ্জন আবার ছাদে উঠে এসেছে। শীতের হাওয়া বইছে, আজ আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় প্রতিটি তারাকে আলাদা ভাবে দেখা যায়। পায়চারি করতে করতে একটা সিগারেট

যখন শেষ হয়েছে সেই সময় খুট করে একটা শব্দ হল। ছাদের দরজা ঠেলে এলো কালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে। সোজা নীলাঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করে খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি রোজ রোজ এখানে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করি, তুমি আগে আস নি কেন?

নীলাঞ্জন থতমত খেয়ে বলল, আমি···আমি, মানে···আমি তো ঠিক—

মেয়েটি বলল, তুমি বুঝতে পারো নি? আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করেছিলাম···

নীলাঞ্জন উত্তেজনায় কাঁপছে। কে মেয়েটি? এখনো সে ভাল করে মুখটা দেখতে পায় নি নিশ্চয়ই শিখা। তার গল্প পড়েই শিখা প্রেমে পড়ে গেছে। একজন লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী আছে? শিখাকে সে সব কিছু দিতে পারে।

মেয়েটি মুখ তুলল।

দারুণ চমকে উঠল নীলাঞ্জন। শিখা তো নয়! তার মা সুজাতা! কিন্তু কী অসম্ভব রূপ এই নারীর! চোখ দুটি আকাশের যে কোন তারার চেয়ে উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটি ভিজে ভিজে। শরীরে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সমান সমান ভাবে মিলে আছে। বুক দুটো কী সম্পূর্ণ নিটোল! কালো রঙের শাড়িতে তাকে মনে হয় স্বয়ং জ্যোৎস্নার রাতই যেন মূর্তিমতী হয়ে এসেছে।

নীলাঞ্জন আস্তে করে তার হাত ছোঁয়াল সুজাতার গালে। কি দারুণ তাপ! রাত্রি নয়, সুজাতা যেন অগ্নিকন্যা! কে বলবে যে এই নারী তিন সন্তানের মা! এবং চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে আছে এঁর!

সুজাতা মুখ তুলে ব্যগ্র ভাবে চেয়ে আছে নীলাঞ্জনের দিকে। নীলাঞ্জন নিজের মুখখানা নীচু করে আনল আস্তে আস্তে। ফিসফিস করে বলল, আমি আমি···

—কি বলছ নীলাঞ্জন ? বল—

—আমি তোমাকে একবার দেখেই—

—বল, নীলাঞ্জন বল—

—একবার দেখেই আমি তো-তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—

—কি বললে ? আবার বল নীলাঞ্জন—

—আমি তোমাকে ভালবাসি।

—আবার বল, আবার বল—

নীলাঞ্জন আর সামলাতে পারল না নিজেকে। নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল সুজাতার ঠোঁটে। সুজাতা জড়িয়ে ধরল তাকে, তার বুক মিশে গেল নীলাঞ্জনের বুকে।

নীলাঞ্জন এর আগে দুটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে। কিন্তু আজকে এই চুম্বনের তুলনায় সে সব অভিজ্ঞতা কিছুই না। তার শরীরে যেন আগুনের হল্‌কা বইছে। তাকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে আছে সুজাতা। সে নীলাঞ্জনের কানে ঠোঁট নিয়ে বললে, আমায় কক্ষনো কেউ ভালবাসে নি, আমার বড় দুঃখ নীলাঞ্জন, কেউ তা বোঝে না।

—আমি তোমার সব দুঃখ মুছে দেবো।

—পারবে ? সত্যি পারবে, নীলাঞ্জন ?

নীলাঞ্জন সুজাতার বুকে মুখ ডুবিয়ে দিল। সুজাতার কোমরে তার হাত, অসম্ভব এক তীব্র আনন্দ তার শরীরে।

সুজাতা বলল, এখানে নয়, তোমার ঘরে চল, তোমার বিছানায় আমরা অনেক গল্প করব, চল নীলাঞ্জন—

নীলাঞ্জন সুজাতাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে···

না, এ ঘটনাটা সত্যি নয়। সকাল সাড়ে ন'টার সময় খাটে শুয়ে লিখতে লিখতে নীলাঞ্জনের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে যেতেই সে-ধড়মড় করে উঠে বসল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন! সুজাতার সঙ্গে অবৈধ প্রেম! সুজাতাকে যতই

তরুণী লাগুক, তিনি তিন সন্তানের জননী, একজন গিন্নীবান্নী মহিলা। মাত্র এক ঘণ্টার আলাপ। তার সম্পর্কে নীলাঞ্জন মনে মনে এই ভাবে। সে তো শিখার সঙ্গেও স্বপ্নে এ রকম একটা কিছু ঘটাতে পারত। কিন্তু স্বপ্ন তো মানুষ ইচ্ছে মতন তৈরি করতে পারে না। মনের মধ্যে কি এক জটিল ব্যাপার থাকে—যাতে এ রকম একটা অদ্ভুত স্বপ্ন তৈরি হয়ে যায়! সুজাতা সম্পর্কে এ রকম কিছু তো সে সজ্ঞানে চিন্তাও করে নি!

এরপর নীলাঞ্জনের অন্য একটা চিন্তা মনে এলো। যে উপন্যাসটা সে লিখছিল, সেটাকে বন্ধ রেখে এ বাড়িটা নিয়েই একটা নতুন উপন্যাস লিখলে কেমন হয়?

।। ছয়

চারজন ছেলে একটা ট্যাক্সি থেকে ধরণীবাবুকে নামিয়ে ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। যুবকগুলি খুবই সহৃদয়, কিছুতেই তারা ট্যাক্সি ভাড়া নিল না। বরেণ অনেক পেড়াপড়ি করেছিল, ওরা কিছুতেই রাজি হল না। বলে গেল, মানুষের জন্য মানুষ তো এটুকু করেই।

রাত সাড়ে ন'টার সময় ধরণীবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন বিডন স্ট্রীটের কাছে একটা বাস স্টপে। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মাটিতে। এই যুবকের দল কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তারা ধরণীবাবুকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যায় একটি ডাক্তারখানায়। ডাক্তার কোরামিন দিয়ে দিয়েছেন। ধরণীবাবু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান নি, সামান্য জ্ঞান ছিল, তাই নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে পেরেছিলেন।

মা একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতপা মাকে এক ধমক দিয়ে বলল, মা, তুমি কি করছ? এখন তোমাকে সামলাব না তুমি বাবাকে দেখবে!

বরেণ ছুটে চলে গেল চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনতে। সেই সময় শিবুও বেরুচ্ছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু ধরণীবাবুর ঐ অবস্থা দেখেও একটা কথা বলল না। কিছুদিন আগে বরেণের সঙ্গে যখন শিবুর বন্ধুত্ব ছিল, তখন বরেণের বাবার এই রকম অবস্থা দেখলে সে নিশ্চয়ই বরেণের সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে যেত। বরেণ মনে মনে বলল, চশমখোর!

রণুর আবার জ্বর এসেছিল তবু সে উঠে এসে বাবার কাছে বসল। বাবার সারা মুখে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন। রণু এর আগে তার বাবাকে কখনো অসুস্থ হতে দেখে নি

ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করে দেখলেন। মাথা নাড়লেন চিন্তিত ভাবে। তারপর বললেন, হার্ট অ্যাটাকের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে ঠিক হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার—

মা একেবারে আর্তনাদ করে উঠলেন—হাসপাতাল? তাঁর স্বামী চিরকাল হাসপাতালকে ভয় পান আত্মীয় স্বজনের খুব গুরুতর অসুখ-বিসুখ হলে হাসপাতালে দেখতে যান না পর্যন্ত। সেই মানুষটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আজকের রাতটা থাক তাহলে। কাল একবার এখানেই ই সি জি করার ব্যবস্থা করব। আসলে মানুষটার ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল। খাওয়া দাওয়া হয় না ঠিক মতন। আমি জানি তো, উনি কত খাটেন।

ডাক্তারের ফি ষোল টাকা। কিন্তু উনি বরেণকে বললেন, তোমার বাবার কাছ থেকে আমি দশ টাকার বেশী নিই না কখনো!

মায়ের কাছে একটা কুড়ি টাকার নোট ছিল। ডাক্তারের কাছে ভাঙানি নেই, তিনি বললেন, কাল সকালে গিয়ে আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে এসো···কিংবা ওষুধ পত্তরও কিছু লাগবে।

যাবার সময় তিনি রণুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ?

রণু ঘাড় নাড়ল।

ডাক্তার রণুর কপাল ছুঁয়ে বললেন, উহু, গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে··· তোমার রক্তটা একটু পরীক্ষা করা দরকার তোমার বাবাকে অনেকবার বলেছি···

ডাক্তারবাবু কুড়ি টাকার নোটটি নিয়ে যাবার পর মায়ের কোষাগারে আর রইল মাত্র সাত টাকা। মাস ফুরোতে আর চারদিন

মাত্র বাকি। বাবা মাইনে পান মাসের দু' তারিখে। এই ক'টা দিন সাতাশ টাকায় অনায়াসে চলে যেত।

মাসের শেষ ক'টা দিন প্রত্যেকটা টাকা হিসেব করে চালাতে হয়। সব টাকারই আলাদা আলাদা নিয়তি নির্দিষ্ট আছে। যেমন রেশন তোলার টাকা দিয়ে কিছুতেই মাছ কেনা যাবে না। সর্ষের তেল ফুরিয়ে গেলেও আর কেনার উপায় নেই, তাতে বরেণের ইউনিভার্সিটিতে যাবার ভাড়ায় টান পড়বে। সব একদম মাপা মাপা। একবার মাসের এক তারিখে রাত্তিরবেলা অনেকক্ষণ লোড শেডিং, সেদিন ওদের মোমও ছিল না, মোম কেনার পয়সাও ছিল না, সেদিন সারাক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু এত বড় বিপর্যয় আর আগে কখনো আসে নি। পরদিনই ডাক্তারবাবু বাবার জন্য অনেকগুলো ওষুধের নাম লিখে দিলেন। ছাপ্পান্ন টাকা লাগবে। বরেণ ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার কাছে টাকা আছে?

মা বললেন, আমি কোথায় টাকা পাবো?

বরেণ গম্ভীর ভাবে বলল, টাকার জোগাড় না করলে তো চলবে না। এখন আরও অনেক টাকা লাগবে। বড় মামার কাছে গিয়ে চাইব?

মা কড়া ভাবে বললেন, না!

রুণু পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঝিম ঝিম করছে মাথার মধ্যে। যেন সে একজন অপরাধী।

বরেণ বলল, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করতে পারি।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, থাক, এক্ষুনি দরকার নেই ধার করার।

কাঠের আলমারি খুলে মা একটা মাটির ভাঁড় এনে দিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, সিকি, আধুলি জমিয়ে ছিলাম। এটা ভেঙে ছাখ, দেড়শো দুশো টাকা হতে পারে।

দু'দিনের মধ্যে বাবার শরীরটা আধখানা হয়ে গেল। ভাল করে হাঁটতে পারেন না। সব সময় ঘুমোন। মাঝে মাঝে যখন উঠে বসেন, তখনও কথা বলতে গেলে গলার আওয়াজটা চিঁ চিঁ মতন হয়ে যায়।

প্রায় জন্ম থেকেই রণু তার বাবাকে দেখেছে একজন দারুণ পরিশ্রমী মানুষ হিসাবে। তিনি যেন এই সংসারের জন্য টাকা উপার্জনের একটি যন্ত্র। ভোরবেলা বেরিয়ে যান মর্নিং স্কুলে। সেখান থেকে ফিরেই আধঘণ্টার মধ্যে স্নান করে, নাকে-মুখে কিছুটা ভাত গুঁজে আবার বেরিয়ে যান। বিকেলে আর বাড়ি না ফিরেই সোজা টিউশানি। ফেরেন ঠিক পৌনে দশটায়। এই ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলছিল। এই টাকা রোজগারের যন্ত্রটি যে হঠাৎ বিকল হয়ে যেতে পারে, সে-কথা কেউ ভাবে নি।

ডাক্তার বলেছিলেন, দু-তিন মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই। বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। তার তীব্র ধরণের অ্যানিমিয়া, নিয়মিত ওষুধ-পত্র আর ভাল খাবার-দাবারের দরকার।

চিকিৎসার জন্য বাবার এক মাসের মাইনের টাকা দশ দিনে খরচ হয়ে গেল। দুটো টিউশানির টাকা এখনও আনা হয় নি। ছাত্রদের সামনেই পরীক্ষা, টিউশানি দুটো এ মাসেই যাবে।

জমা টাকা বলতে কিছু নেই। মাত্র মাস ছয়েক আগেই ব্যাংকে যে হাজার দুয়েক টাকা ছিল, সেটা তুলে এনে দাঁওতে পাওয়া ভরি ছয়েক সোনা কিনে রাখা হয়েছে। সোনার দাম দিন দিন বাড়ছে, সুতরাং বিয়ের সময় তো কিছু সোনা লাগবেই, তখন আরও বেশি দামে সোনা কিনে লাভ কি? এক মাসের মধ্যেই সুতপার পার্ট টু পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে। এর মধ্যেই তার জন্য পাত্র দেখা চলছিল। বরেণ ক্রমে কম পড়ছে, কিন্তু নিজের পড়ার খরচ সে নিজে চালাতে পারে না।

আগামী কাল মামলার তারিখ। বাবার বদলে বরেণকে যেতে হবে কোর্টে। বরেণ এ সব ঝামেলা মোটে পছন্দ করে না। কিন্তু উপায় তো নেই। বাড়িওয়ালারা এই সময় উঠে পড়ে লেগেছে। একবার এই মাস্টার পরিবারটাকে তাড়াতে পারলে তাদের কত লাভ। বরেণরা বাড়ি ভাড়া দেয় পৌনে দুশো টাকা, তারা উঠে গেলেই এই নীচতলাটা অন্তত সাড়ে তিনশো চারশো টাকায় ভাড়া হবে। হোক না আড়াইখানা ঘর, কিন্তু কত বড় বাথরুম। বরেণের সবচেয়ে বেশি রাগ হয় শিবুর ওপর।

।। সাত ।।

কফি হাউসে ঢুকতেই নীলঞ্জন দেখতে পেল ডান পাশের একটি টেবিলে তিন চারজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসে আছে শিখা। নীলাঞ্জন কয়েক পলক তাকিয়ে রইল শিখার দিকে। নীলাঞ্জন ঠিক বুঝতে পারল না কথা বলবে কিনা। রমেনবাবুর মেয়ে, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বটে, কিন্তু এমন কিছু বেশী আলাপ হয় নি যে বাইরে দেখা হলে কথা বলতে পারে। তাছাড়া শিখা রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। মেয়েরা আগে কথা না বললে নীলাঞ্জন নিজে থেকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সে চলে গেল ভেতরের দিকে।

আর কোন টেবিলেই নীলাঞ্জনের চেনা কেউ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, এক সময় কফি হাউসের প্রায় প্রত্যেক টেবিলেই নীলাঞ্জনের চেনা কেউ না কেউ থাকত, ছাত্র জীবনে। এখন সব বন্ধুরাই নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। নীলাঞ্জনও অনেকদিন কফি হাউসে আসে নি। সে ভেবেছিল, পুরোনো কালের মতন, সে ভেতরে ঢুকলেই বিভিন্ন টেবিল থেকে তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হবে।

একটা ফাঁকা টেবিল দেখে নীলাঞ্জন বসে পড়ল। তার লজ্জা লাগছে। একা একা কোনদিন সে এখানে বসে নি। বেয়ারারা সবাই তার মুখ চেনে। নিশ্চয়ই বেয়ারারা ভাবছে, হায়, হায়, এই লোকটার এখন আর একজনও বন্ধু নেই। আগে কত বন্ধু ছিল!

এক কাপ কফি নিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নীলাঞ্জন, এই সময় শিখা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, সে টেরও পায় নি। হঠাৎ চমকে উঠল।

শিখা জিজ্ঞেস করল, আপনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন ?

নীলাঞ্জন আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, না, মানে, আপনি বসবেন ? বসুন না।

শিখা দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আপনাকে তো এখানে দেখি না।

—অনেক দিন পর এলাম।

—আপনি আমাদের টেবিলে একটু আসবেন ?

—আমি ? কেন ?

—আমার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চায়, ওরা আপনার লেখা পড়েছে।

নীলাঞ্জন লজ্জা পেয়ে যেন প্রায় কুঁকড়ে গেল। তার লেখা সত্যিই এরা পড়েছে ? মাত্র সাত আটটা গল্প ছাপা হয়েছে তার। দু-চারজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ কখনো তার লেখার বিষয়ে কোন কথা বলে নি।

নীলাঞ্জন বলল, আচ্ছা, কফিটা শেষ করে নি।

শিখা নিজেই নীলাঞ্জনের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, ওখানে বসে খাবেন। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

শিখার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ হল। দুটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে। ছেলে দুটি নীলাঞ্জনের কোন লেখা পড়েছে কিনা বোঝা গেল না, কারণ মন্তব্য করল না কিছুই। মেয়ে দুটি নীলাঞ্জনের একটি মাত্র গল্প পড়েছে, যেটা সবেমাত্র একটি সিনেমার পত্রিকায় বেরিয়েছে। নীলাঞ্জনকে ডেকে আনায় অন্য ছেলে দুটি খুব সম্ভবত খুশি হয় নি, তারা গম্ভীর হয়ে গেল। শিখা আর অন্য দুটি মেয়ে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। নীলাঞ্জন কিছুতেই লাজুকতা কাটিয়ে চোখে চোখে কথা বলতে পারল না। এক সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আমি চলি।

এর পরদিনই রাত্তির নটার সময় এসপ্ল্যানেডের বাস স্টপে শিখার সঙ্গে আবার দেখা হল নীলাঞ্জনের। একটু আগে সিনেমা ভেঙেছে, তাই বাসগুলোতে দারুণ ভিড়। শিখা কথা বলছিল দুটি ছেলের সঙ্গে,

কালকের সেই ছেলে দুটি নয়, অন্য। নীলাঞ্জন ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। মনে মনে সে কৌতুক বোধ করল খানিকটা। শিখার সঙ্গে আগে তো কোনদিন তার দেখা হয় নি, অথচ পর পর দু'দিন···। এই রকম অনেক মজার ঘটনা হয়।

অন্য একটা বাস ধরে নীলাঞ্জন বাড়ির কাছে নামল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। দোকান থেকে সিগারেট দেশলাই কিনে মুখ ফিরিয়েই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিখা। সে হাসছে।

শিখাই প্রথমে বলল, আপনি একটা অদ্ভুত মানুষ!

নীলাঞ্জন বলল, তাই নাকি?

—চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই কথা বলে। আপনি এড়িয়ে যান কেন? এই তো খানিকটা আগে এসপ্ল্যানেডে আপনাকে দেখলাম, আমরা তো একসঙ্গেই ফিরতে পারতাম। আপনি চোরের মতন চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে—

—তাই নাকি? আমাকে তখন চোরের মতন দেখাচ্ছিল?

—হ্যাঁ অবিকল। আপনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি আপনাকে দেখতে পাই নি? মেয়েরা সব দেখতে পায়।

—আপনি অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—কালও কফি হাউসে আপনি প্রথমে আমাকে দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন।

—না, ঠিক তা নয়।

—দেখুন, আমরা একই বাড়িতে থাকি, অথচ বাইরে দেখা হলেও কথা বলি না! মানুষের সভ্যতাটা কী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে।

নীলাঞ্জন মনে মনে স্বীকার করল শিখা মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। কোন ন্যাকামি নেই, পরিষ্কার ভাবে কথা বলে।

বড় রাস্তা থেকে খানিকটা হাঁটতে হয়। দুজনে পাশাপাশি এগুলো। শিখার কথায় ছোট ছোট উত্তর দিতে দিতে নীলাঞ্জন একটা

কথা না ভেবে পারল না। সে আর শিখা একসঙ্গে ফিরবে। বাড়ির সব লোক যদি ভাবে ওরা একসঙ্গে কোন জায়গা থেকে এলো? নীলাঞ্জন কিছুতেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারবে না। শিখার বাবা রমেনবাবু বলেছিলেন, ব্যাচেলারদের থাকতে দেয় না এ সব বাড়িতে। কী ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি?

আর একটা কারণেও নীলাঞ্জন নিজেকে একটু অপরাধী ভাবে। সে শিখার মায়ের সঙ্গে প্রেম করেছে। স্বপ্নে অথবা কল্পনায়। কেউ জানে না সে কথা, শিখার মা তো জানেনই না, তবু তারপর থেকে নীলাঞ্জন আর ওঁর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাতে লজ্জা পায়।

তিনতলায় পৌঁছে শিখা বলল, সকালবেলা আপনি ক'টার সময় বেরোন?

—সাড়ে দশটা এগারোটা।

—কাল ন'টা আন্দাজ আপনার কাছে আমি একবার আসব, একটা দরকার আছে। আপনার অসুবিধে হবে?

—না না, অসুবিধে কী?

পরদিন সকালে আগে থেকেই নীলাঞ্জন জামা-টামা পরে তৈরি হয়ে ছিল। রাত্রে সে অনেকক্ষণ ভেবেছে, তার সঙ্গে শিখার কী দরকার? শিখাকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। এ রকম একটি মেয়ের সাহচর্যে নীলাঞ্জনের খুব ভালই লাগবার কথা। কিন্তু একই বাড়ি বলে তার অস্বস্তি লাগছে। যদি এই নিয়ে আবার কোন গোলমাল হয়—

ঠিক ন'টার সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে শিখা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। জিজ্ঞেস করল, আসব?

নীলাঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, আসুন।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে শিখা বলল, বাবা বলছিলেন, আপনাকে আমাদের ঘরে ডাকতে। আমি বললাম আমি চা নিয়ে যাচ্ছি। দাঁড়ান, আমার চা-টাও নিয়ে আসি। আপনি কিছু খাবেন? খাবেন না? শুধু দুখানা এগ-টোস্ট।

চা আর খাবারের প্লেট ছাড়াও শিখা নিয়ে এলো একটা চামড়া বাঁধানো খাতা। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বলল, একটা ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি মাঝে মাঝে এলে কী আপনি বিরক্ত হবেন?

নীলাঞ্জন বলল, বিরক্ত হব কেন? আপনার মতন একটি সুন্দরী মেয়ে—

শিখা এমন ভাবে হাসল যার স্পষ্ট অর্থ, যাক, মুখে কথা ফুটেছে তা হলে! এবার সে বলল, যদি আপনার বিশেষ কিছু আপত্তি না থাকে তাহলে আমায় আপনির বদলে তুমি বলতে পারেন।

নীলাঞ্জন বলল, সেটার জন্য বোধহয় কয়েকদিন সময় লাগবে।

—ক'দিন?

—তার কি কোন ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করব আজ থেকেই···কিন্তু আমি আপনাকে কী সাহায্য করব?

—বলছি, আগে চা-টা খেয়ে নিন।

নীলাঞ্জন মুখ তুলে দেখল, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন রমেনবাবু, ভুরু দুটো কুঁচকে আছেন, অথচ ঠোঁটে হাসি।

নীলাঞ্জন বলল, আসুন রমেনবাবু, ভেতরে আসুন।

—না, থাক।

সেই রকম ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রমেনবাবু সরে গেলেন। নীলাঞ্জন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

শিখা এবার কালো খাতাটি হাতে নিয়ে বলল, আমি কিছু কবিতা লিখেছি। অনেক দিন ধরেই লিখি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না কিছু হচ্ছে কিনা। আপনি একটু দেখে দেবেন?

— এই সাহায্য ?

—হ্যাঁ। আপনার সময় নষ্ট হবে ?

নীলাঞ্জনের বুকটা হালকা হয়ে গেল। কবিতা দেখে দেওয়া ? এটা আবার একটা সাহায্য ?

—কোথাও ছাপা হয়েছে কবিতা ?

—না।

নীলাঞ্জন আরও বেশী মনের জোর ফিরে পেল। শিখার কোন কবিতা ছাপা হয় নি। সেই তুলনায় নীলাঞ্জন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তরুণ লেখক। এখন সে শিখার সঙ্গে অনেক বেশী আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলতে পারে।

—দেখি খাতাটা।

—আমি কয়েকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

খাতাটা খুলেও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল শিখা। নীলাঞ্জনও চুপ। সারা বাড়ির গোলমাল তাদের কানে আসছে। দোতলায় কী একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চ্যাঁচামেচি করছে শিবু, একতলা থেকে কেউ উত্তর দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

শিখা হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল, কবিতা পড়ার সময় কেউ ডিস্টার্ব করলে আমার একদম ভাল লাগে না।

আবার সচকিত হয়ে উঠল নীলাঞ্জন। শিখা দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। একটু আগে রমেনবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ভাবে হেসে গেলেন। এ সব কী ব্যাপার ? এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই তো ?

সে একটু কড়া গলায় বলল, দরজা বন্ধ করার কোন দরকার ছিল না।

শিখা বিস্মিত ভাবে মুখ তুলে বলল, কেন ?

—তুমি আর আমি এ ভাবে দরজা বন্ধ করে বসলে তার অন্য মানে হতে পারে।

—কী অন্য মানে?

—তোমার বাবা একটু আগে দেখে গেলেন।

—তাতে কী হয়েছে?

—তাতে কিছু হয় নি?

হঠাৎ শিখা হাসিতে ভেঙে পড়ল। থামেই না হাসি। নীলাঞ্জন দারুণ অপ্রস্তুত।

শিখা হাসি মুছে বলল, আপনি কি ভাবলেন আপনার সঙ্গে আমি প্রেম করতে এসেছি? জোর করে?

—না, তা নয়, তোমার অনেক বন্ধু আছে আমি জানি।

—কোন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ে এক ভাবে থাকলেই প্রেম করতে হবে? অন্য কোন কথা থাকতে পারে না? মেয়েরা বুঝি সব সময় প্রেম করে? তাদের আর অন্য কোন চিন্তা নেই?

—কিন্তু বাড়ির লোকজন—

—বাড়ির লোকজন কী ভাবে তা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার বাড়ির লোকজন আমাকে জানে। সকাল ন'টার সময় সকলের চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি প্রেম করতে বসব? আপনি এত ভীতু?

—তোমার বাবা একটু আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসছিলেন।

—কেন হাসছিলেন বুঝতে পারলেন না? বাবার সিগারেট খাওয়া বারণ, আপনার কাছ থেকে সিগারেট নিতে এসে আমাকে দেখে ধরা পড়ে গেলেন।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। দরজা না খুলে রাখলে আপনি কবিতা শুনবেন না?

—শিখা, তুমি বেশ সাহসী মেয়ে।

—সবাই চায় মেয়েরা ভীতু হয়ে থাকুক, পুরুষদের তৈরি সব নিয়ম কানুন মেনে চলুক।

—আমি তা বলি নি।

—এবার তা হলে কবিতাগুলো পড়ি ?

নীলাঞ্জন হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল একটা। শিখা বলল, আরও একটা কোন্ কারণে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম জানেন ? আমিও একটা সিগারেট খাব। আপত্তি আছে ?

—এই তো! ছেলেরা দরজা খুলে রেখে সিগারেট খায়, কিন্তু মেয়েদের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়।

—অনেক ছেলেও মা বাবাকে দেখে সিগারেট লুকোয়। সেটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু আমরা কি তর্ক করব শুধু ?

—না, কবিতা শুনব।

শিখা নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে রাখল। কিন্তু দেশলাইটা স্পর্শ করল না। অর্থাৎ সে অপেক্ষা করছে নীলাঞ্জন তাকে ধরিয়ে দেবে। নীলাঞ্জন তার জ্বলন্ত সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল।

প্রথম টান দিয়েই খুক খুক করে কাশল শিখা। অর্থাৎ তার অভ্যেস নেই। কিন্তু সিগারেটটা ধরে আছে ঠিক মেমসাহেবদের মতন কায়দা করে। হঠাৎ লাজুক লাজুক হেসে সে বলল, এবার পড়তে শুরু করি ?

—হ্যাঁ।

শিখা পর পর পাঁচ ছ'টা কবিতা পড়ে গেল। শুনতে শুনতে নীলাঞ্জন ক্রমশই বেশ অবাক হচ্ছিল। মেয়েদের লেখা সম্পর্কে নীলাঞ্জনের খুব একটা উঁচু ধারণা নেই। সে দেখেছে, বেশীর ভাগ মেয়েই কিছু লিখতে পারে না। কিন্তু শিখার কবিতাগুলি বেশ ভাল। শুধু ভাল নয়, নতুন ধরনের।

নীলাঞ্জন বলল, বাঃ, চমৎকার। খুব ভাল লিখেছ।

শিখা বলল, আপনার কাছ থেকে আমি প্রশংসা শুনতে চাই নি। মেয়েরা কবিতা পড়লেই ছেলেরা প্রশংসা করে। অনেকে খুব উচ্ছ্বাস

দেখায়। যেন মেয়েদের পক্ষে কবিতা লেখাটাই একটা দারুণ ব্যাপার। যা লিখেছে, তাই যথেষ্ট! তাই না?

—আমার কাছ থেকে তুমি কী শুনতে চাও?

—সত্যি কথা।

—সত্যিই তোমার কবিতাগুলো আমার ভাল লেগেছে। দাও তো, একবার আমি নিজে পড়ি।

—আমি চাই, আপনি আমার ভুলগুলো দেখিয়ে দেবেন।

—ভুল তো কিছু নেই। এগুলো ছাপা হওয়া উচিত। আমি চেষ্টা করব কোথাও ছাপিয়ে দেবার।

—না না, আমি ছাপাতে চাই না। এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি।

—তুমি কবিতা লিখতে শুরু করেছ কবে থেকে?

—এই তো, গত বছর।

—এমনি এমনি হঠাৎ কবিতা লেখার ইচ্ছে হল?

—আগে পড়তাম খুব। কবিতা পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। তারপর একদিন মনে হল, আমার কিছু কথা আছে, যা কারুকে মুখে বলা যায় না, চিঠিতেও জানানো যায় না। শুধু কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

—বাঃ!

—তারপর হঠাৎ একদিন লিখে ফেললাম একটা!

লাজুক ভাবে হেসে ফেলল শিখা। নীলাঞ্জনও হাসতে লাগল। এমনিতে এত স্মার্ট, কিন্তু কবিতার প্রসঙ্গে তার মুখে লজ্জার লালচে আভা পড়েছে, চোখ মাটির দিকে। এটাই খাঁটি কবির লক্ষণ।

—দিদি, দিদি! বলে দু'বার ডাক শোনা গেল। শিখার ছোট বোনের গলা। শিখা যেন সেটা শুনতেই পেল না।

নীলাঞ্জন বলল, তোমায় ডাকছে বোধহয়।

—ডাকুক! আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো?

নীলাঞ্জন আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়াল।

হঠাৎ একটা কথা মনে এসেছে তার। শিখা কি কোন কারণে তার প্রেমে পড়ে গেছে? মুখে মুখে চটপটে কথা বললেও ভেতরে হয়তো মেয়েটি খুবই নরম। প্রেমে না পড়লে কোন মেয়ে এ রকম দরজা বন্ধ করে কোন ছেলের সাথে কথা বলে? শিখা কোন ভয় পাচ্ছে না, তবু সে ভয় পাচ্ছে কেন? সে তো পুরুষ।

নীলাঞ্জন বলল, না আমার কোন কাজ নেই, আমি সারাদিন তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারি।

শিখা বলল, কিন্তু আপনি তো রোজ দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

—তা যাই। কিন্তু তুমি যদি চাও, আমি সারাক্ষণ থাকতে পারি।

—না, আপনাকে আমি আটকে রাখব কেন? তা ছাড়া, আমারও কলেজ আছে।

—শিখা, তোমাকে একটা কথা বলব? অনুমতি দেবে?

—বলুন!

—তুমি যে খুব সুন্দর, তুমি জানো?

শিখা এ কথা শুনে লজ্জা পেল না, একটুও গুরুত্ব দিল না। খাতা গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—তোমাকে বুঝি আগেও অনেকে এই কথা বলেছে?

—না। অনেকে শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন?

—মিথ্যে? সত্যিই তো তুমি খুব সুন্দর!

শিখা মাথা দুলিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেসে বলল, না, সত্যি নয়। আমি জানি, আমি খুব সুন্দরী নই, আবার খুব খারাপ দেখতেও নই। এই, মাঝারি ধরনের।

নীলাঞ্জন হাত বাড়িয়ে শিখার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, চলে যাচ্ছ কেন? আর একটু বসো!

—আচ্ছা বসছি।

নীলাঞ্জন বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। সে কি বোকার মতন ব্যবহার করছে? শিখা কি তার কাছ থেকে কিছু আশা করছে? মনে মনে হাসছে, অন্য কোন পুরুষ মানুষ এর কম অবস্থায় কী রকম ব্যবহার করত? উত্তেজনায় নীলাঞ্জনের শরীরটা একটু একটু কাঁপছে।

সে হঠাৎ শিখার গালে হাত ছুঁইয়ে বলল, তোমাকে একটু আদর করব?

—কী?

—তোমাকে একটু আদর—

—ঘরের দরজা বন্ধ আছে বলেই বুঝি এ কথা বলছেন?

—না না, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

—আগে তো কখনো এ কথা বলেন নি! আপনাকে আমি কিন্তু এ রকম ভাবি নি। ভেবেছিলাম, আপনি অন্যদের চেয়ে আলাদা!

নীলাঞ্জনের গালে যেন ঠাস করে একটা থাপ্পড় পড়ল। সে কি তা হলে চোখের ভাষা জানে না? শিখার দৃষ্টিতে সে তো স্পষ্ট আহ্বান দেখেছিল।

অপমানিত মুখে সে বলল, তুমি বুঝি দরজা বন্ধ করে আমায় পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে?

—না তো···দরজা বন্ধ করেছিলাম···নিরিবিলিতে পড়ার জন্য··· আপনি রাগ করবেন না আমার ওপরে···আমি চাই আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসব, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব।

—শিখা, আমি ভাল লোক নই।

—যাঃ, মোটেই না।

—তোমার অনেক বন্ধু আছে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—বিশেষ একজন কোন বন্ধু নেই?

—হ্যাঁ, তাও আছে।

—ও, আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম···যাক, কিছু মনে করো না।

—কী ভেবেছিলেন?

—ভেবেছিলাম, আমি তোমার বন্ধু হব···তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

—সেই জন্যে আপনি আমাকে দেখলেই এড়িয়ে যেতেন?

—সেটা অন্য ব্যাপার।

—আপনি যদি আমার বন্ধু হতে চান, তা হলে আমি খুব গর্বিত হব। আপনি এত ভাল লেখেন···তা হলে আমি আবার আসব তো?

—হ্যাঁ, তোমার যখন ইচ্ছে,···কিন্তু তখন দরজা খোলা রাখতে হবে, নইলে আমি আবার খারাপ হয়ে যেতে পারি!

শিখা কোন কথা না বলে ভ্রুভঙ্গি করে রহস্যময় ভাবে হাসল। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সে যখন দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে, তখন নীলাঞ্জন বলল, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি কি একদিন রাত্তিরবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে?

শিখা ভুরু তুলে বলল, সে কি! আমি ছাদে কাঁদতে যাব কেন?

আট ॥

রণুর আবার জ্বর আসছে। কিন্তু কারুকে বলে না সে কথা! মায়ের চোখ এড়িয়ে থাকে। বাবার এ রকম অসুখের মধ্যে রণুর নিজের আবার অসুখ হওয়াটা দারুণ স্বার্থপরতা নয়? কেন যে তার জ্বর হয়! আর কারুর হয় না। শুধু তার কেন হবে? একদম ভাল লাগে না।

এতকাল সংসারটা টেনে এসে বাবা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যখন জেগে থাকেন, একটাও কথা বলেন না, চোখের সামনে একটা যে কোন বই খুলে নিয়ে বসেন, কিন্তু বোঝাই যায়, পড়ায় মন নেই। একটু বাদেই চোখ ঢুলে আসে ঘুমে। বহুদিন বাবার বই পড়ার অভ্যাস নেই। পড়বেন কখন? সময় ছিল কোথায়? ইস্কুল মাস্টারের বই পড়ার সময় থাকে না।

দ্বিতীয় মাসেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার করতে হল। মা সেই কথাটা তুলতেই বাবা কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে প্রয়োজনীয় কাগজে সই করে দিলেন। ডাক্তার বলেছেন বাবাকে মাঝে মাঝে একটু বাইরে বেরিয়ে হাঁটা চলা করতে। বাবা যেতে চান না। আবার ভাল হয়ে উঠে আগের মতন কাজকর্ম শুরু করার ইচ্ছেটাই যেন চলে গেছে তার। শরীর দুর্বল হয়ে গেলে মানুষের মনও দুর্বল হয়ে যায়।

মাঝখানে একটু যেন ভাল হয়ে উঠলেন বাবা। স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার জয়েন না করলে মাইনে কাটা যাবে। বাবা বললেন, সামনের সোমবার থেকে তিনি স্কুলে যাবেন। তার দু' দিন

আগে, শনিবার সকালে বাবা বললেন, আজ আমিই বাজারটা করে নিয়ে আসি।

বাবাকে তো একলা পাঠানো যায় না, তাই রণু গেল সঙ্গে। থলি হাতে নিয়ে। আগে রণু দেখেছে, বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন হন হন করে। কিন্তু এখন হাঁটছেন খুব আস্তে আস্তে। আগে প্রত্যেকটা তরকারির দোকানে দারুন দরদাম করতেন, কিন্তু এখন আর সেদিকে মনই নেই। প্রত্যেক দোকানের সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকছেন, তারপর যেন ঘুম ভেঙে বলে উঠছেন, ও হ্যাঁ, দাও তো!

হঠাৎ বাবা বললেন, রণু, আমার মাথা ঘুরছে, আমাকে ধর! রণু বাবার হাত চেপে ধরল, কিন্তু বাবা তবু ধড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে। বহু লোক ছুটে এলো হৈ হৈ করে।

বাবা আবার শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

মাঝরাত্রে শীতের জন্য রণুর ঘুম ভেঙে গেল। কম্বল রয়েছে গায়ে। তবু এমন শীত করছে কেন? রীতিমত কাঁপুনি লাগছে। গত বছর ছিঁড়ে গিয়েছিল লেপটা। এ বছর নতুন লেপ তৈরি করার কথা ছিল, তা আর হয়ে ওঠে নি। আর হবেও না।

কিন্তু এমন তো বেশী কিছু শীত নয়, তবু শীত করছে এত? রণু নিজের কপালে হাত দিল। হুঁ, আবার জ্বর আসছে। আসছে মানে কি, এসে গেছে। দূর ছাই, ভাল্লাগে না!

রণুকে উঠে পড়তেই হল। জানালার একটা পাল্লা বন্ধ আছে। আর একটা পাল্লাও বন্ধ করে দেবে? তাহলে আর একটুও হাওয়া আসবে না।

খাটের তলা থেকে সে পুরোনো ট্রাঙ্কটা টেনে বার করল। তার ভেতর রয়েছে সানুদার সেই শালটা। সেটা গায়ে জড়াতেই তার দারুণ আরাম হল। পুরোনো আমলের শাল, খুব গরম হয়। এটা গায়ে দিয়েই রণু আজ শুয়ে থাকবে। সকালবেলা আবার ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেই হবে।

টাকাগুলোও সাবধানে বার করে গুণে দেখল সে। ঠিকই আছে। চার হাজার দুশো পঁচিশ। টাকাগুলো ছুঁতেই রণুর গা'টা আরও গরম হয়ে যায়। তার কাছে এত টাকা আছে, কেউ জানে না।

রণু একবার চমকে জানালাটার দিকে তাকাল। ঠিক যেন মনে হল, সানুদা এসে দাঁড়িয়ে আছে। রোজই এ রকম মনে হয়।

সানুদা আসে নি একদিনও। সানুদা সম্পর্কে সে প্রায়ই পাড়ার মোড়ে নানান্ রকম উল্টো পাল্টা কথা শোনে। কেউ বলে সানুদা সেই মারামারির পর নিজেও মরে গেছে। কেউ বলে সানুদা পালিয়ে গেছে মধ্যপ্রদেশে। আবার কেউ বলে সানুদাকে পরশু দিনও একজন মৌলালির মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে দেখেছে। রণুর দাদাই তো একদিন বলল, সানুদাকে নাকি পুলিশ একদিন একটুর জন্য ধরতে পারে নি। সানুদাকে একটা ট্যাক্সির মধ্যে দেখে পুলিশ ফলো করেছিল। তারপর ট্যাক্সি হাওড়া ব্রীজ পেরোবার আগেই পুলিশ সেটাকে ধরে ফেলল। তখন দেখা গেল ট্যাক্সিটা খালি। সানুদা চলন্ত ট্যাক্সি থেকেই মাঝপথে নেমে পড়ে পালিয়েছে। অবশ্য দাদাটা বড্ড মিথ্যে কথা বলে!

সানুদার সম্পর্কে যদি আরও কিছু খবর পাওয়া যায়, এই জন্য রণু একদিন গেল ওদের বাড়িতে। দোতলায় মান্তুদের ঘরের সামনে মান্তুর মাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, মাসীমা, মান্তু কোথায়?

মান্তুর মা সব সময় একটা না একটা অসুখে ভোগেন। যত অসুখে ভুগছেন, ততই তিনি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন। অথচ এক সময় বেশ হাসিখুশি ছিলেন।

তিনি গোমড়া মুখে বললেন, কেন, মান্তুকে কী দরকার ?

রণু বলল, ও আমার একটা বই নিয়েছিল অনেকদিন আগে, ফেরৎ দেয় নি।

মান্তুর মা বললেন, কে জানে, সে কোথায়! সারাদিন তো ধিঙ্গিপনা করে বেড়ায়! পড়াশুনো সব গোল্লায় গেছে!

রণু জানে, এ বাড়িতে এলেই কারো না কারো কাছ থেকে খারাপ কথা শুনতে হবে। কেউ সোজা সরল ভাবে কিছু বলে না। যেন একটা অভিশপ্ত বাড়ি।

রণু উঠে এলো তিনতলায়।

সানুদার ঘরের দরজাটা খোলা দেখেই রণুর বুকটা ধক্ করে উঠল। সানুদা ফিরে এসেছে? না, তা হতেই পারে না, পুলিশ খুঁজছে সানুদাকে। নিশ্চয়ই অন্য কোন ভাই দখল করে নিয়েছে সানুদার ঘরটা। সানুদা ফিরে এলে আবার এক চোট ঝগড়া শুরু হবে। রণু ঘরে উকি দেবার সাহস পেল না।

মান্তুকে পাওয়া গেল ছাদে। জলের ট্যাঙ্কের পাশে পা ছড়িয়ে বসে একটা খাতায় কী যেন লিখছে।

রণুকে দেখে সে একটু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি খাতাটা বন্ধ করে ফেলল। বলল, কি রে রণু ?

রণু বলল, তোর কাছে আমার একটা বই ছিল…'আশ্চর্য দ্বীপ' …সেই বইটা নিতে এসেছি।

—সেটা তো ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি।

—না তো, ফেরৎ দিস নি, আমার দরকার এখন।

মান্তু ব্যাপারটায় একটুও গুরুত্ব না দিয়ে বলল, কে জানে, তাহলে সেটা কে নিয়ে গেছে! আমার কাছে নেই। তুই এতদিন বাদে চাইতে এসেছিস কেন? আগে মনে ছিল না?

অনেক ছেলেবেলা থেকেই রণুর সঙ্গে মান্তুর ভাব। কিন্তু কিছুদিন হল মান্তু যেন কী রকম বদলে গেছে। এ পাড়ার সবচেয়ে বখাটে

ছেলে সুখেন্দু একদিন বলেছিল, মান্তু ওকে চিঠি লেখে। একই পাড়ার ছেলে সুখেন্দুকে চিঠিতে কী লেখে মান্তু? এখনও কি মান্তু চিঠি লিখছিল? তাকে দেখে লুকিয়ে ফেলল?

—সানুদার খবর কী রে, মান্তু?

—সানুকাকা? কেন, সানুকাকার খবর দিয়ে কী দরকার?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—সানুকাকাকে তো পুলিশ দেখলেই মেরে ফেলবে! সানুকাকা একটা খুনী!

—সানুদা তো একটা গুণ্ডাকে মেরেছে। নইলে সে-ই সানুদাকে মেরে ফেলত! এটা মোটেই দোষের কাজ না!

—কী জানি বাবা! সানুকাকা বাবাকে চিঠি লিখেছিল মুঙ্গের থেকে। টাকা চেয়েছিল। আমার বাবা কেন টাকা দেবে?

রণুর শরীরটা কেঁপে ওঠে। সানুদার নিশ্চয়ই এখন খুব টাকার দরকার। লুকিয়ে থাকতে গেলে তো অনেক টাকা লাগবেই। যদি সানুদার বাড়ির লোকেরা জানতে পারে যে রণুর কাছে সানুদার টাকা জমা আছে···। রণু বলল, আমি চলি!

—আয় না, বোস না আমার কাছে!

—না। তুই সুখেন্দুকে কিস করেছিস, মান্তু?

—কে বলল?

—সুখেন্দুই বলছিল।

মান্তু হঠাৎ হি হি করে অসভ্যের মতন হেসে বলল, বেশ করেছি! তোর বুঝি হিংসে হয়েছে তাতে?

আর কথা না বাড়িয়ে রণু বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা চিন্তার বোঝা চেপে রইল। সানুদার টাকার দরকার। যে কোন সময় এসে টাকা চাইতে পারে!

টাকাগুলো পুরোনো কাগজ-পত্রের তলায় আবার খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখে রণু। তার বুকে ব্যথা করে।

সে জানে, তাদের পরিবারের ওপর একটা অভাবের কালো ছায়া পড়েছে। সব সময় টাকা নেই, টাকা নেই ভাব। তার মা, দাদা, দিদির মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। শুধু টাকা থাকা না থাকার ওপর মানুষ কত বদলে যায়! সবাই ধরে নিয়েছে, বাবা আর কোন-দিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন না।

কেউ জানে না, একমাত্র রণুই পারে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে। পাড়ার ডাক্তার বলেছিলেন, একজন স্পেশালিস্টকে এনে দেখাতে। কত ফি লাগে একজন স্পেশালিস্টের? একশো, দুশো, পাঁচশো টাকা? রণু পারে। অনায়াসেই দিতে পারে সেই টাকা। মা আর দাদা একদিন ফিসফিস করে পরামর্শ করছিল, মধুপুরে মায়ের বড় মামার একটা বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে যদি একমাস থাকা যায় —কিন্তু কত খরচ হবে, অন্তত হাজার দেড়েক, বাড়ি ভাড়া না লাগলেও ট্রেন ভাড়া, খাবার খরচ, হঠাৎ যদি সেখানে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ডাক্তার ডাকতে হবে···সেইজন্য আর মধুপুর যাবার কথাটা বেশী গুরুত্ব পায় নি। যে মানুষটা বছরের পর বছর কপালের ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে এই সংসারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাজার দেড়েক টাকা খরচ করা যায় না।

কিন্তু রণু পারে। সে কালই সে মা আর দাদাকে বলতে পারে —যাও, মধুপুরের টিকিট কিনে আনো, এই নাও ট্রেনের ভাড়া। সেখানকার খরচ চালাবার জন্য ভয় পাচ্ছ? এই নাও দু' হাজার। রণু বাবাকে একদম সুস্থ করে ফিরিয়ে আনবে মধুপুর থেকে।

রণু আর একবার তাকাল জানালার দিকে। সানুদা যে কোন মুহূর্তে এসে বলতে পারে—দে, আমার টাকা দে!

সানুদা এখন খুনী আসামী, তার এখন বেশী টাকার দরকার। সানুদা বিশ্বাস করে রণুর কাছে টাকা রেখে গেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সানুদা কোন না কোন সময় এসে হাজির হবেই। তখন

যদি রণু বলে টাকাটা খরচ হয়ে গেছে, তাহলে সান্নুদা কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? যদি হঠাৎ খুব রেগে যায়? কিংবা খুব দুঃখ পেয়ে বলে, রণু, শেষ পর্যন্ত তুই-ই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলি?

সান্নুদা খুনী, তার মানে কি সান্নুদার কাছে রিভলবার আছে?

আসলে রণুর নিজেরই চাই একটা রিভলবার। রণু তার ডান হাতটা রিভলবারের মতন করে চারপাশে ঘোরাতে লাগল। সত্যি সত্যি একটা রিভলবার পেলে সে সকলকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। একটা রিভলবারের দাম কত টাকা? চার হাজার দুশো পঁচিশ টাকা দিয়ে সে একটা রিভলবার কিনতে পারবে না?

বরেণ আজকাল আর পড়তেই বসে না। রাত্তিরবেলা বাড়িতেও ফেরে অনেক রাত্রে। আগে বাবার ভয়ে সে বাবার থেকে আগে ফিরে আসত। এখন বাবা বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু বাবাকে ভয় পাবার কিছু নেই আর।

মা একদিন বরেণকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস রে?

বরেণের ভাব ভঙ্গি অনেকটা হেড অব দা ফ্যামিলির মতন হয়ে গেছে এরই মধ্যে। গম্ভীর ভাবে বলল, আমি একটা টিউশানি পেয়েছি এ মাস থেকে। সেই নিউ আলিপুরে, সেখান থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়!

মা অবাক হয়ে বললেন, তুই সন্ধ্যেবেলা টিউশানি করবি? সে কি! আর মাস দেড়েক পরেই তো তোর ফাইন্যাল পরীক্ষা!

—পরীক্ষা আমি দেব না ভাবছি!

—কী বললি? পরীক্ষা দিবি না? এত দূর পর্যন্ত পড়েও পরীক্ষা দিবি না?

—কী হবে পরীক্ষা দিয়ে? আমি চাকরি খুঁজছি। অনেককে বলে রেখেছি।

—তুই যে বলেছিলি, আরও পড়বি, রিসার্চ করবি।

—মা, তুমি এত অবুঝ কেন? বুঝতে পারো না যে বাবার পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হবে না? এখন থেকে আমাকেই সংসার চালাতে হবে!

—ডাক্তার যে বলেছেন, কিছু দিন বিশ্রাম নিলেই উনি ভাল হয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ, মানে. তা হবেন, কিন্তু অত পরিশ্রম আর বাবাকে করতে দেব কেন। আমি দায়িত্ব না নিলে···

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুই এই পরীক্ষাটা অন্তত দিয়ে নে!

—কোন লাভ নেই, এই পরীক্ষায় বসলে আমি ফেল করব! সব সময় টাকার চিন্তা নিয়ে পড়া হয় না!

রণু সব শুনল আড়াল থেকে। টাকা, টাকা, টাকা! টাকা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই!

পরদিন রণুর ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। মা এসে দরজা ধাক্কাতেই সে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল। তার অন্য কোন কথা মনে ছিল না।

মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই চাদরটা কার?

রণুর তখন খেয়াল হল। তার গায়ে সান্নুদার চাদর। ধরা পড়া চোখের মতন সে কুঁকড়ে গেল। একবার তার মনে হল, সব সত্যি কথা বলে দেয়। কিন্তু পারল না।

সে আমতা আমতা করে বলল, কোন্‌টা? এটা তো—মানে—এটা সন্দীপের।

—সন্দীপের চাদর? তুই এনেছিস কেন? কখন এনেছিস?

—কাল ইস্কুল থেকে···খেলার সময় সন্দীপ আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল, তারপর আমি সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি···

—কই, কাল যখন ইস্কুল থেকে ফিরলি, তখন দেখলাম না তো!

একবার একটা মিথ্যে কথা বললে, তার জের টেনে যেতে হয়। রণুর স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সন্দীপরাই বেশ বড়লোক, তার এ রকম চাদর থাকতে পারে। যদিও আজকাল কোন স্কুলের ছেলেই এ রকম শাল গায়ে দিয়ে স্কুলে যায় না। কিন্তু মাকে বোঝাতেই হবে। সে জোর দিয়ে বলল, ছিল, তুমি লক্ষ্য কর নি।

মা তবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। বললেন, সন্দীপ জানে না তুই এটা এনেছিস?

—হ্যাঁ জানে।

—তাহলে এনেছিস কেন? খেলা হয়ে যাবার পর ওকে ফেরৎ দিস নি কেন?

—মানে সন্দীপ রাখতে দিয়েছিল, তারপর নিজেই কখন বাড়ি চলে গেল··

সন্দীপদের বাড়ি বেশী দূর নয়। এক একদিন সকালে সন্দীপ রণুকে ডাকতে আসে সকালবেলা—যদি আজই চলে আসে সন্দীপ? এতগুলো মিথ্যে কথা রণু একসঙ্গে আর কখনো বলে নি। ভেতরে ভেতরে সে কাঁপছে।

—আজই ফেরৎ দিয়ে দিবি। দামী জিনিস।

সুতরাং সেদিন স্কুলে যাবার সময় রণুকে শালটা নিয়ে বেরুতে হল। বাড়ি থেকে বেরিয়েই শালটা খুব ছোট করে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখতে হল তাকে। সানুদাদের বাড়ির কেউ দেখলে চিনে ফেলতে পারে। সানুদা যে কী বিপদেই ফেলে গেল তাকে! মাকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে যেতেন। সানুদা এখন একজন খুনী আসামী, তার শাল লুকিয়ে রাখা কি সোজা কথা! তা

ছাড়া টাকাটা? সানুদা যদি টাকার কথা সবাইকে বলে দেয়, তাহলে কী হবে? টাকাটা কি সানুদার কাছে দিয়ে আসা হবে? কিন্তু যারা সানুদাকে একটুও ভালবাসে না, তারা ঐ টাকা পাবে কেন? তাদের তো কোন অধিকার নেই। টাকাটা পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসা উচিত? কিন্তু পুলিশ যদি বিশ্বাস না করে? পুলিশ যদি বলে, হেবোকে খুন করার পর সানুদা লুকিয়ে এসে এই টাকাটা তার কাছে রেখে গেছে! এটা কোন চুরি-ডাকাতির টাকা! তাহলে?

কিংবা টাকাটা বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ করা হবে? তারপর, লুকিয়ে লুকিয়ে সানুদা একদিন আসবে। তার ভীষণ টাকার দরকার। তাকে পালাতে হবে এ দেশ ছেড়ে, একটুও সময় নেই। সানুদা বলবে, দে রণু, টাকাটা দিয়ে দে ঝটপট!

একটা রিভলবার, একটা রিভলবার না থাকলে রণু কিছুই সামলাতে পারবে না।

কিংবা, যদি আর একটা কাজ করা যায়…। সানুদা যেদিন টাকাটা চাইতে আসবে, মানে, যদি আসে, রণু বলবে, টাকা? কিসের টাকা? আমি আপনার টাকার কথা কী জানি? আমার কাছে আপনি টাকা চাইছেন কেন?

সানুদা রেগে উঠবে, চ্যাঁচামেচি করবে, তখন রণু চেঁচিয়ে উঠবে, পুলিশ! পুলিশ!

তক্ষুণি পুলিশ না হোক, অনেক লোক নিশ্চয়ই ছুটে আসবে সেই চ্যাঁচামেচি শুনে। পাড়ার সবাই সানুদাকে খুনী বলে জানে। তারা সবাই জাপটে ধরবে সানুদাকে, অত লোকের হাত এড়িয়ে সানুদা নিশ্চয়ই পালাতে পারবে না। সানুদাকে দেওয়া হবে থানায়। তারপর বিচারে যদি সানুদার ফাঁসী হয়, ব্যস, আর কেউ কোন দিন রণুর কাছ থেকে চাইতে আসবে না টাকা!

বিচারের সময় সানুদা যদি বলেও যে রণুর কাছে তার টাকা জমা আছে, তখনও রণু স্রেফ অস্বীকার করবে সে কথা! রণু বলবে,

ধর্মাবতার, উনি আমার আত্মীয় হন না, কিছু হন না, শুধু শুধু উনি কেন আমার কাছে টাকা রাখতে যাবেন!

বিচারক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন রণুর কথাই। সানুদার ফাঁসী-টাঁসী হয়ে গেলে সে বলবে যে ঐ টাকাটা সে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে ·· ভাবতে ভাবতে রণুর চোখে জল এসে যায়! না না, সে চায় না সানুদা মরে যাক! সানুদাকে কেউ ভাল না বাসলেও সে ভালবাসে!

এখন কথা হচ্ছে, এই শালটা রাখা হবে কোথায়? রণুর গায়ে বেশ জ্বর, তার আজ ইস্কুলে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু মাকে এ কথাটা বললেই মা আরও বেশী ভয় পেয়ে যেতেন। তা ছাড়া শালটার কথা চ্যাঁচামেচি করে শুনিয়ে দিতেন বাবাকে, দাদাকে। রণুর কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

ইস্কুলের কোন বন্ধুর কাছে···দারোয়ানের কাছে···কিংবা বাগবাজারে পিসেমশাইদের বাড়িতে শালটা রেখে আসবে? যেখানেই রাখুক, জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

তারপর রণুর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে শালটাকে ফেলে দিল মাটিতে। বেশ ধুলো লাগল সেটাতে। আবার মাটিতে ফেলে ভাল করে ধুলো লাগাল। এবার ঠিক হয়েছে!

ইস্কুল পেরিয়ে সে চলে গেল শ্যামবাজারে। সেখানে একটা শালকরের দোকানে শালটা কাচতে দিয়ে রসিদটা যত্ন করে রেখে দিল পকেটে। সানুদা শাল চাইতে এলে সে এই রসিদটা দিয়ে দেবে।

বাবাঃ বাঁচা গেল! মস্ত বড় একটা ঝামেলা চুকল। এখন একমাত্র কাজ বাকি রইল, কোন ছুতোয় সন্দীপের সঙ্গে ঝগড়া করা। যাতে সে অন্তত এক মাসের মধ্যে আর তাদের বাড়িতে না যায়। সে পরে দেখা যাবে।

যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে, এখন আর ইস্কুলে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া জ্বরে তার মাথা ঝিমঝিম করছে! সে হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম পার্কে গিয়ে খানিকটা ছায়া মাখা ঘাসের ওপর শুয়ে রইল।

রণুর ঘুম ভাঙল বেশ বিকেলে। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তবু তাকে তো বাড়ি ফিরতেই হবে। সবাই চিন্তা করবে। খিদেও পেয়েছে খুব। হাঁটতে ইচ্ছেই করছে না। রণু রিকশা করে বাড়ি যেতে পারে। ভাড়া কে দেবে? রণু নিজেই দিতে পারে—সানুদার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা বার করে নিয়ে ··রণু কোনদিন ইস্কুল থেকে রিক্‌শা করে বাড়ি ফেরে নি। আজও ফিরবে না। সে পা টেনে টেনে চলতে লাগল।

রণুকে দেখে মা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, চাদরটা সন্দীপকে দিয়ে এসেছিস?

রণু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

সে এর মধ্যেই পাকা মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা রণুর দুটো বিশ্রী অভিজ্ঞতা হল। শুধু বিশ্রী নয়, ভয়েরও।

মাঝে মাঝে দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনরা দেখতে আসে বাবাকে। কেউ কোন উপকার করে না, শুধু উপদেশ দেয়। এদের জন্য আবার চা তৈরি করে দিতে হয় মাকে। শুধু শুধু পয়সা খরচ। সেদিন এসেছিলেন এক মেসোমশাই। তিনি বেশ বড়লোক আর অহংকারী। শুধু দুটো কমলালেবু নিয়ে এসেছেন। খুব ভারিক্কী চালে বললেন, কই, দেখে তো মনে হচ্ছে না খুব অসুখ! জোর করে মনের জোর আনলেই সব ঠিক হয়ে যাবে--

বাবা একটাও কথা বললেন না তাঁর সঙ্গে।

মেসোমশাই বললেন, কই, উঠে দাঁড়ান তো একবার। দেখি!

বাবা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

মেসোমশাই মাকে বললেন, দিদি, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন। আজকাল মনের জোরটাই আসল।

মা বললেন, কী জানি! শরীরে একদম শক্তি নেই। একটুও হাঁটতে পারেন না। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয় ··

—জোর করে বেরিয়ে পড়লেই হয়। এই রণু, বাবাকে নিয়ে পার্কে যাবি সকালবেলা, বেশ খানিকটা হাঁটিয়ে আনবি।

রণু বলল, বাবা বাজারে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন!

মেসোমশাই গুরুত্বই দিলেন না সে কথায়। সারাক্ষণ বকবক করে গেলেন। বাবা সারাক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বাবাকে যখন চা দেওয়া হয়েছে সেই সময় বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, বুলা দেখ! আমার গায়ে পোকা!

মা বললেন, কই?

সুতপাও বলল, পোকা! কোথায় বাবা?

বাবা বললেন, দেখতে পাচ্ছিস না? আমার সারা গায়ে পোকা কিলবিল করছে! দেখতে পাচ্ছিস না?

মা বললেন, কোথায় পোকা? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, তোমাদের চোখ নেই? এটা কি? এই যে ভাল করে ছাখ! বাবা নিজের গা থেকে খুঁটে তুললেন সত্যিই একটা পোকা। ছারপোকার চেয়েও ছোট। কিন্তু জ্যান্ত!

সুতপা বলল, ও একটা পোকা, কোথা থেকে এসে বসেছে।

বাবা বললেন, একটা নয়, অনেক! এই ছাখ, আমার সারা গায়ে ছোট ছোট তিলের মতন আটকে বসে আছে। আমার শরীর পচে গেছে! আমার চামড়া খসে খসে পড়বে! হে ভগবান, আমি কী পাপ করেছিলাম—

বাবা খুব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। রণু কোনদিন তার বাবাকে কাঁদতে শোনে নি। তার জাঁদরেল বাবা, স্কুলে সবাই যাকে ভয় করত, সেই তিনি একটা শিশুর মতন কিংবা একটা পাগলের মতন কাঁদছেন।

রণু দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। লোকলজ্জার ভয়ে মা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিজের ঘরে রণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে জানত না সে বাবাকে এত ভালবাসে।

জ্যান্ত মানুষের গায়ে সত্যিই পোকা হয়? বাবার সব কিছু সেরে যাবে। যদি এক মাসের জন্য মধুপুরে নিয়ে যাওয়া যায়। মাত্র দেড় হাজার টাকা! রণুর কাছে আছে, অনেক টাকা—

রাত আটটার সময় বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে দারুন ঝগড়া লাগল বরেণের, ওরা আজকাল খুবই বাড়াবাড়ি করছে। যখন তখন জল বন্ধ করে দেয়। সেদিন বরেণ টিউশানি করতে যায় নি। বরেণের সন্ধ্যের পর স্নান করা অভ্যেস। বাথরুমে ঢোকবার পর মাঝপথে জল বন্ধ হয়ে গেছে। গামছা পরে বেরিয়ে এসে বরেণ বলল, জল কে বন্ধ করেছে? আমি পুলিশ কেস করব।

ওপর থেকে শিবু ভেংচিয়ে বলল, যাও না, কে বারণ করেছে?

বরেণ বলল, যাবই তো। এক্ষুণি যাব।

—যা না, শুধু তড়পাচ্ছিস কেন? তোর কত মুরোদ আমার জানা আছে—

—মুখ সামলে কথা বলবি।

—এক্ষুণি চলে যা। ঐ গামছা পরেই চলে যা।

—মুখ ভেঙে দেব শূয়োরের বাচ্চা!

—আরে যা, যা মান্‌কে! একবার নেমে এলে চালতাবাগানের ছাতুওয়ালার ছাতু বানিয়ে দেবো!

—নেমে আয় না শালা!

শিবুর দাদা রতন বলল, এই শিবু, তুই চুপ কর। ছোটলোকদের সঙ্গে শুধু ঝগড়া করে লাভ নেই। ছ্যাখ না, ওদের আমি কি রকম টাইট দিচ্ছি—

বরেণ আরও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। রতনদা তাকে ছোটলোক বলল! সে আরও গলা চড়িয়ে বলল, এঃ, ভারী ভদ্দরলোক! অশিক্ষিত বাপের টাকায় বারফট্টাই মারে, ভারী একখানা বাড়ি আছে বলে, জাতের ঠিক নেই—

—এই হারামীর বাচ্চা, চুপ কর, নইলে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব—

—তোদের বাপ হারামীর বাচ্চা···তোদের চোদ্দগুষ্টি হারামী··· বেজন্মার জাত···

ওপরে ওরা দুজন, নীচে বরেণ একা। সে একাই লড়ে যাবে। ক্রমে খিস্তিখাস্তা আরও চরমে উঠল। নিজের ঘরের মধ্যে বসে রণু শিউরে শিউরে উঠছে। তার দাদা যে এত খারাপ খারাপ কথা উচ্চারণ করতে পারে, সে জানতই না। বাবা মা শুনছে, তবু দাদার ভ্রুক্ষেপ নেই। অন্যদিন দাদা একটু চ্যাচামেচি করলেই মা এসে বারণ করেন, আজ এক সময় মা-ও এসে দাদার সঙ্গে যোগ দিলেন। মা বলতে লাগলেন, টাকা আছে বলে ওরা যা খুশি করবে, যখন তখন জল বন্ধ করে দেবে, দেশে আইন কানুন নেই, ছি ছি, নীচু জাত কি আর সাধে বলে···

রণু ভাবল, শেষকালে কি তার দাদাও সানুদাদের বাড়ির লোকদের মতন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করবে রোজ রোজ? মা দাদাকে উৎসাহ দেবেন? তারা এত নীচে নেমে যাবে? এ বাড়িতে তাদের আর থাকা উচিত নয়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে টেঁকা যায় না। অন্য বাড়ি দেখে উঠে গেলেই হয়। কিন্তু অন্য বাড়িতে গেলেই বেশী ভাড়া লাগবে। অন্তত ডবল। আবার সেই টাকা! শুধু টাকার জন্য তারা খারাপ হয়ে যাবে।

একটা রিভলবার, একটা রিভলবার থাকলে রণু সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিত।

বরেণ আজকাল সব সময় খিটখিট করে। একটুও হাসে না। সে এ রকম ছিল না মোটেই। রণু তার দাদার দুঃখটা বোঝে। বরেণের খুব শখ ছিল সে এম. এ. পাশ করে রিসার্চ করবে। তারপর

বিদেশে যাবে। কিন্তু এখন তাকে পড়াশুনো ছেড়ে চাকরি খুঁজতে হচ্ছে। রণু একদিন শুনেছিল, দাদা তার এক বন্ধুকে খুব তেতো গলায় বলেছিল, একটা দুশো-আড়াইশো টাকার কেরানিগিরি পেলেও এখন নিয়ে নিতাম। অথচ আগে দাদা সব সময় বলত, আর যা-ই হই, কেরানি কিংবা মাস্টার হব না কক্ষনো! কিন্তু চাকরি করতে হবে বলেই কি দাদাকে এত খারাপ হয়ে যেতে হবে? কত লোক তো চাকরি করে! কই, সবাই তো রিসার্চ করে না!

রণু আর থাকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে দাদার হাত চেপে ধরে বলল, দাদা, দাদা, ঘরে চলে এসো!

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বরেণ বলল, তুই যা! ওরা আসুক না, দেখি ওদের কত মুরোদ!

রণু বললে, মা, দাদাকে বারণ কর!

মা সে কথা গ্রাহ্য না করে দাদার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, সব সময় গায়ের জোর দেখাবে? কেন, দেশে থানা পুলিশ নেই? আমরা কি বিনা ভাড়ায় থাকি?

শেষ পর্যন্ত রতন-শিবুর সঙ্গে বরেণের মারামারিই লেগে যেত, এই সময় রমেনবাবু আর নীলাঞ্জন এসে পড়ায় ঝগড়াটা তখনকার মতন থামিয়ে দিলেন। নীলাঞ্জনবাবুকে গুপ্তচর ভেবেছিল রণু, কিন্তু মানুষটা ভাল। বাবার অসুখ শুনে একদিন দেখতে এসেছিলেন।

যত রাত হতে লাগল, তত বাড়তে লাগল রণুর মাথার যন্ত্রণা। সে কারুকে কিছু বলে নি। মা-ও আজকাল তেমন লক্ষ্য করেন না। সব কিছু ছন্নছাড়া হয়ে গেল কেমন। সবই টাকার জন্য। অথচ রণুর কাছে টাকা আছে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। রণুর কাছে টাকা না থাকলে তার এত যন্ত্রণা হত না। দিদিকে যেমন কিছুই মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। দিদি তো বাবার অসুখের পরেও প্রায়ই সেজে-গুজে বেড়াতে যায়।

একটা যদি কোন মন্ত্র পাওয়া যেত। এমন একটা মন্ত্র, যেটা উচ্চারণ করলেই সকলে বলত, না না, আমরা আর খারাপ হব না। আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসব। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে রতনদা আর শিবুদাকে বলত, তোমরা আর খারাপ ব্যবহার করবে? তোমরা অনীতাদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। কেন অনীতাদি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন! অনীতাদিকে ফিরিয়ে আনবে বল? নইলে তোমাদের নরকে পাঠাব। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে সানুদাকে বলত, আপনি আর কোনদিন মারামারি করবেন না বলুন। আপনার টাকা আমরা খরচ করেছি, রাগ করবেন না বলুন! সেই মন্ত্র দিয়ে রণু তার বাবাকেও সারিয়ে তুলবে। বাবাকে নিয়ে যাবে মধুপুরে, মাত্র দেড় হাজার টাকা··

সে রকম মন্ত্র কেউ রণুকে দেবে না। একটা রিভলবার, মন্ত্রের বদলে একটা রিভলবার পেলেও রণু সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। সকলের কপালের সামনে রিভলবার উঁচিয়ে ধরে বলবে, তোমরা সব ভাল হও!

এই পৃথিবীতে সবাই সবাইকে যদি ভালবাসে, তাহলে সব কিছু কত সরল হয়ে যায়। তবু মানুষ কেন এত ঝগড়া করে!

দুটো রুটি, খানিকটা আলু পোস্তর তরকারি আর খানিকটা গুড় দেওয়া হয়েছিল রাত্রির খাবার হিসেবে। এখন আর রোজ মাছ হয় না। রণুর খাবার ইচ্ছে ছিল না। খানিকটা নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। তারপর আর বই পড়তেও ইচ্ছে করল না। শুয়ে পড়ল, তবু ঘুম আসে না। কেউ যদি মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কে দেবে? মা আসতে পারবেন না, থাকবেন বাবার পাশে। দিদিও আসবে না। দিদি আজ বেশ রাত করে ফিরেছে, তাই মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, দিদি রাগ করে শুয়ে পড়েছে। দিদি নাকি সোনা বিক্রী করতে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত!

সেদিন দিদি বাড়ি ফিরেছিল তিনতলার সেই নীলাঞ্জন বাবুর সঙ্গে। দিদির শাড়িতে ধুলো কাদা লেগে আছে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মা তো সেই অবস্থায় দিদিকে দেখে আঁতকে উঠেছিলেন।

নীলাঞ্জনবাবু মাকে বললেন, ভয় পাবেন না, বিশেষ কিছু হয় নি, তবে অনেক কিছু হতে পারত···।

নীলাঞ্জনবাবু ফিসফিস করে পুরো ঘটনাটা বলেছিলেন, ভবানীপুরের কাছে যেখানে সারি সারি অনেকগুলো গয়নার দোকান, সেখানে দিদি গিয়েছিল সোনা বিক্রি করতে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিদি দোকানে ঢুকতে সাহস করে নি। কী ভাবে সোনা বিক্রি করতে হয় দিদি তো জানে না! কয়েকবার এগিয়ে গেছে দোকানের দিকে, আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে ফুটপাথে। এই সময় একটা লোক, অনেকটা ভদ্রগোছের চেহারা, দিদির হাতের ব্যাগটা ধরে এক টান দেয়। লোকটা ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েই পালাত। কিন্তু দিদি দারুণ শক্ত করে ধরে ছিল ব্যাগটা। টানের চোটে দিদি পড়ে যায় রাস্তার ওপরে। তখনও কিন্তু ব্যাগটা ছাড়ে নি। ইতিমধ্যে রাস্তার লোকজন এসে ওদের ঘিরে ফেলে। তখন সেই লোকটা বলে যে, দিদি তারই বোন, কিন্তু মাথা খারাপ, সেইজন্য লোকটা ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দিদি শুধু কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা—! কান্নার চোটে দিদি কথা বলতে পারছিল না। এর মধ্যে আবার দিদির ব্যাগটা খুলে গিয়ে সোনা বেরিয়ে পড়ে!

ভিড়ের লোকজন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। এদিকে সেই লোকটা দিদিকে বাড়িতে নিয়ে যাবার নাম করে তখনও টানাটানি করছিল।

এই সময় হঠাৎ নীলাঞ্জনবাবু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ভিড় দেখে উঁকি মারেন। তিনি দিদিকে চিনতে পারেন! ছিনতাইবাজটা কিন্তু তখনও দিদির নামে বানিয়ে বানিয়ে যা-তা কথা বলছিল।

নীলাঞ্জনবাবু ভিড়ের লোকদের বললেন, বেশ তো, সবাই মিলে থানায় চলুন তাহলে! থানার নাম শুনেই লোকটা পালিয়ে গেল।

নীলাঞ্জনবাবু সত্যি ভাল লোক। ওর জন্যই দিদি আজ খুব জোর বেঁচে গেছে।

সব কথা শুনে মা তো প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন, সোনা! তুই সোনা পেলি কোথায়?

দিদি সোনা চুরি করেছিল। নিজের বাড়ি থেকেই।

দিদির বিয়ের জন্য এই সোনা কিনে রেখেছিলেন বাবা। দিদি গোপনে সেই সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল।

নীলাঞ্জনবাবু ওপরে চলে যাবার পর দিদি বলেছিল, আমার বিয়ের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। যদি আমি কখনো বিয়ে করি, তা হলে শুধু একটা শাঁখা পরে শ্বশুরবাড়ি যাব। আর যদি সে রকমভাবে আমায় কেউ বিয়ে করতে রাজি না হয়, তাহলে আমি বিয়েই করব না। তা বলে বাবার চিকিৎসা হবে না?

দিদির বিয়ে একজনের সঙ্গে ঠিক করাই আছে। সামনের শীতকালে বিয়ে হবার কথা। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আবার দিদির সঙ্গে মায়ের তুমুল ঝগড়া লেগে গেল।

ঝগড়া আর ঝগড়া! শুধু ঝগড়া! যদি অনীতাদি একটু হাত বুলিয়ে দিত মাথায়! অনীতাদি নেই। অনীতাদি, তুমি কোথায়? আমার কথা তোমার একটুও মনে পড়ে না?

জানালার কাছে কে? সানুদা এলো নাকি? না, কেউ নয় তো। সানুদা, তুমি কেন আসছ না? সানুদা, তুমি এসো, তোমার টাকাগুলো সব নিয়ে যাও, আমাকে মুক্তি দাও! সানুদা, আমি আর পারছি না—

রাত দুটোর সময় রণু উঠে বসল বিছানায়। আবার খুব শীত করছে তার। কাল তবু সানুদার শালটা ছিল। নিজেরই বোকামিতে রণু ধরা পড়ে গেছে।

রণু একটা উপায় ঠিক করে ফেলেছে। আর কোন রাস্তা নেই। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। শিগ্‌গিরই তার কঠিন একটা অসুখ হবে বোধহয়। তাহলে বাড়ির লোক তাকে নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়বে। একেই তো বাবার অসুখ, তার ওপর সেও যদি অসুখে পড়ে, দাদা আর মা কি করবে? টাকা পয়সা আসবে কোথা থেকে? রণুর কাছে টাকা আছে, সে টাকা সে কিছুতেই খরচ করতে পারবে না। বাবা-মা-ই তো তাকে শিখিয়েছিলেন কক্ষণো পরের টাকা না নিতে। বিশেষ করে একজন খুনী আসামীর টাকা। সানুদা, তোমাকে যে যা-ই ভাবুক, আমি তোমাকে খারাপ ভাবব না।

বাক্স খুলে সে আবার টাকাগুলো গুণে দেখল। সব ঠিক আছে। সে একটা টাকাও খরচ করে নি। সানুদা বিশ্বাস করে রাখতে দিয়েছিলেন, সে বিশ্বাস সে ভাঙে নি। সে একবার মনে মনে ভেবেছিল, সানুদা মরে গেলে ভাল হয়। সে জন্য সে অনুতপ্ত। না, সে সানুদার মৃত্যু চায় না। সানুদা বেঁচে থাকুক। পুলিশ সানুদাকে ক্ষমা করে দিক। সানুদা আবার ভাল হয়ে যাক।

রণু অন্য কারুরই মৃত্যু চায় না। সে চায় পৃথিবীতে সবাই সুখী হোক। কেউ যেন আর কারুকে কখনো না মারে, কেউ যেন আর খারাপ ভাষায় গালাগালি না দেয়। যদি তারা এ বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও একটা ভাল বাড়ি নেয়···দিদির বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যায় যদি···দাদা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে রিসার্চ শুরু করে, বাবা ভাল হয়ে উঠে আবার কাজ শুরু করেন, মায়ের খুব শখ একবার পুরীতে যাওয়ার, মা কখনো সমুদ্র দেখেন নি···অনীতাদির সঙ্গে তাঁর বরের ঝগড়া মিটে গেলে অনীতাদি আবার হাসতে হাসতে বেড়াতে আসবেন এ বাড়িতে···।

এমন কোন মন্ত্র হয় না, যাতে এই সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারে। এমন কি একটা রিভলবার পেলেও সব কিছু ঠিক হবে না। কিন্তু তবু রণু পারে। সে সব ঠিক করে দেবে।

রণুর কত জ্বর এখন ? একশো চার পাঁচ হবে বোধহয়। সে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। তবু তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছে অদ্ভুত রকমের। সে আর পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট দেখবে না। সে সব ঠিক করে দেবে।

একটা মাত্র উপায় আছে। রণু বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা দড়ির মতন করল। বিছানার ওপর চেয়ারটা তুলে তার ওপর দাঁড়িয়ে ঘরের ছাদের যে হুকটায় পাখা ঝোলার কথা অথচ পাখা নেই, সেটার মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল চাদরের দড়িটা। তারপর একটা ফাঁস বাঁধল, বাঃ চমৎকার ! এবার নীচে নেমে এসে সে তার রাফ খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। কি লিখবে সে ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে অসম্ভব। কেন এমন হচ্ছে, সে তো ভয় পায় নি ! নিশ্চয় জ্বরের ঘোরে সে তার হাত ঠিক রাখতে পারছে না। মনে জোর এনে সে চিঠিখানা শেষ করল। খুবই ছোট চিঠি :

সকলের উদ্দেশ্যে :

এ পৃথিবীতে কেউ কারুকে ভালবাসে না। আমি এ পৃথিবীতে আর বাঁচতে চাই না। ইতি—রণেন।

পুনশ্চ : (আমার নাম রণেন, কিন্তু আমি জীবনযুদ্ধে হেরে গেলাম।)

পুনশ্চ পুনশ্চ : মা, বিদায়। ইতি তোমার রণু।

চিঠিখানা লিখে বেশ সন্তুষ্ট হল রণেন। এটাই সবচেয়ে ভাল হবে। সে মরে গেলে, তার জন্যে আর কারুকে কিছু খরচ করতে হবে না। সে মরে গেলে, একদিন না একদিন তার ঘরের সব জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি হবেই। তখন টাকটা পেয়ে যাবে মা কিংবা দাদা। যতই অবাক হোক, টাকাটা ঠিকই কাজে লেগে যাবে। সানুদাও আর টাকা চাইতে পারবে না। সে মরে গেল আর কার কাছে চাইবে ? অন্য কেউ তো সানুদার টাকার কথা জানে না।

চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রণু আবার বিছানার ওপরে উঠে দাঁড়াল। ফাঁসটা গলায় পরে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। না, সে ভয় পায় নি। পায়ের ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

গলায় প্রথম চাপ লাগবার মুহূর্তে সে একবার মাত্র ডেকে উঠল, মা—

রণুর জ্ঞান ফিরল পরদিন সকাল এগোরোটায়। হাসপাতালে।

প্রথমে রণু বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে। তারপর সে দেখল কতকগুলো মুখ। সবাই তার খাট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দিদি রতনদা, শিবুদা। শিখাদি, নীলাঞ্জনবাবু, আর কে? অনীতাদি না? অনীতাদি কোথা থেকে এলো! এরা সবাই এক জায়গায় একসঙ্গে কি করে এলো? রতনদা ফিসফিস করে তার দাদার সঙ্গে কথা বলছে।

রণু ভাবল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? না সত্যি? সে একবার চোখ বুজে আবার চোখ মেলল। সেই সব মুখ তখন তার দিকে চেয়ে আছে। সবাই একসঙ্গে কি করে এলো এখানে? এটা কোন্ জায়গা? তবে কি রণু মন্ত্রটা পেয়ে গেছে?

রণু বেশী ভাবতে পারছে না। তার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। তবু খুব একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে রণু পাশ ফিরে শুলো। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। রণু এখন সাড়া দেবে না। যদি ঘোর ভেঙে যায়। যদি মনে হয় এ সবই স্বপ্ন!

——